কর্ণাটরাগ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ১২

শ্রীযোগজীবন চক্রবর্ত্তী
গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ পক্ষে

প্রথম সংস্করণ :
আষাঢ়, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ :
এস্ স্কোয়ার

বাঁধাই :
রঞ্জন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯।

মূল্য : চার টাকা

উৎসর্গ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

এই লেখকের :—

জনপদ বধূ
দেবকন্যা
সিন্ধুর টিপ
শান্তির স্বাক্ষর
স্বপ্ন সঞ্চার
এ জন্মের ইতিহাস
সীমা স্বর্গ
শ্বেত কপোত
এই তীর্থ
তীর ভূমি
নীলাঞ্জনছায়া
বিদিশার নিশা
দুই নদী
জলকন্যার মন
একটি রঙ করা মুখ
নতুন নাম নতুন ঘর
নীলসিন্ধু
এক আশ্চর্য মেয়ে
কত আলোর সঙ্গ
মধ্য দিনের গান
পথ (নাটক)

"কৃপাণপাণি গজ-দন্তখণ্ডম্
একং বহন্ দক্ষিণহস্তকেন।
সংস্তূয়মানঃ সুর-চারণৌঘৈঃ
কর্ণাটরাগঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ। —(সঙ্গীতদর্পণ)

মহীশূরের সেই অরণ্য-অঞ্চল যে আমার একেবারে অ-দেখা ছিল, তা নয়। কিন্তু, মাত্র কয়েকদিনের দেখাতেই কি একটা অঞ্চলের মর্মকথা জানতে পারা যায়? একটা অঞ্চলই বা কেন, একটি মানুষের মর্মকথাও কি জানতে পারা যায়, মাত্র দু-চার দিন তাকে বাইরে থেকে দেখে? অরণ্য আমি আরও দেখেছি, আমাদের বাঙলাদেশেরই উত্তরে তরাই-অঞ্চল, তারপরে ছোটনাগপুরের অরণ্য; কিন্তু, সব ছাড়িয়ে মহীশূরের অরণ্য-স্মৃতিই যে একদিন আমার মনটাকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাবে,—সে কথা আব্বাসীর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি নি। বলা বাহুল্য, অরণ্য-কথা আমি বলতে বসিনি, আমি বলতে চাই একটি মানুষের কথা,—একটি বিচিত্র মানুষের কথা। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। এই দশ বছর ধ'রে তার কথা প্রতিনিয়তই যে মনে পড়েছে এমন নয়, কিন্তু তার ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, থেমে থেমে ধীরে ধীরে কথা-বলার ধরন, তার মলিন ম্লান হাসি,

হঠাৎ-ই এক-এক সময় সুস্পষ্ট ভেসে ওঠে আমার চিত্তপটে। বিশেষ ক'রে তার কথা মনে পড়ে যায় ঠিক তখনি, যখন নির্বেদ আসে অন্তরে, যখন সংশয়ের কালো মেঘ এসে ঘিরে ফেলে চিত্তের আকাশ, যখন মানুষের ভালবাসা, ত্যাগ আর ক্ষমাকে ছাড়িয়ে হীন স্বার্থ, হিংসা আর কপটতা নির্লজ্জের মতো আত্মপ্রকাশ করে।

অন্তরের অন্তস্তলে তার কাহিনীকে লালন ক'রেছি দশবছর ধ'রে। দশবছরে বহুবার অভিলাষ হয়েছে তার কথা সবাইকে ডেকে বলতে ; দশবছরে বহুবার লোভ হয়েছে, তার কথা তারস্বরে ঘোষণা করি, আর বলি,—এমন একটি মানুষকে আমি দেখেছি, যে আমাদের থেকে আলাদা, যার ধরন-ধারণ আমাদের মতো হয়েও ঠিক আমাদের মতো নয়, যার জীবন আমাদের মতো সংঘাত সংকুল হয়েও বিচিত্র এক ফল আহরণ ক'রেছে, যে-ফলের স্বাদ আমরা পাইনি, সে পেয়েছে। অথবা আমরাও পাই, আস্বাদ করতে জানিনা। তার অন্তর্মুখী জীবন তাকে আস্বাদন করতে শিখিয়েছে।

এই দশবছর ধ'রে আরও একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি। ভেবেছি, আমাদের "উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ" হলেও, বিশাল ভারতের সমগ্র রূপটি আমাদের মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট নয়। সুস্পষ্ট নয় বলেই কোথায় গুডালুর, কোথায় মহীশূর—এসব জায়গার মানুষের কথা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ ক'রেছি, ভেবেছি,—আমি বাঙ্‌লাদেশের মানুষ, দেশে ফিরে এসে শহরের একপ্রান্তে কোনক্রমে বাসা করে আছি, আমি ওদের কথা বলতে যাবো কেন? আমার ভাষায় যারা কথা বলে, আমার মতো পোশাক যারা পরে, আমারই মতো আচার-ব্যবহার যাদের,—তাদের কথাই বরং আমি বলব। কিন্তু এই দশবছর ধ'রে

আমার দেশটাকে দেখতে-দেখতে ভুল আমার ভাঙ্‌ছে। দেশ-বিভাগের যারা প্রত্যক্ষ বলি, তাদের দেখেছি, দেশবিভাগের যারা পরোক্ষ বলি, তাদেরও দেখেছি। দেখেছি নিজেকেও। নিজেও যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রসাদপুষ্ট মানুষ তেমন বোধ হয় নি। তারা কেউ গেছে আন্দামানে, কেউ দণ্ডকারণ্যে। প্রশ্ন করেছে,—আমাদের দেশ তাহলে প্রকৃত কোনটা ?

"উত্তরে হিমগিরি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার, পূর্বে —পূর্ব বাঙ্‌লা ?"

না। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, রোজ্ কী খাবো কী পরবো, সেকথা যাদের রোজ ভাবতে হয়,—তাদের দেশ উত্তরে হিমালয় পেরিয়ে অনেক দূরে, দক্ষিণে মহাসমুদ্র পেরিয়ে আরও দূরে, পশ্চিমে আরব সাগর ছাড়িয়ে,—পূর্বে ব্রহ্মদেশ পার হয়ে দূর-দূরান্তে। অর্থাৎ, হয় আমাদের কোনো দেশ নেই, নয়ত আমাদের দেশ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। এ-কথা দিনের-পর দিন ধ'রে বুঝতে শিখেছি বলেই আব্বাসীকে দূরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। সে আমার ভাষা না বললেও আমার কাছের মানুষ,—সে আমার বাসার পাশে না থাকলেও নিকটতম প্রতিবাসী। তার সুখদুঃখের সঙ্গে আমার সুখদুঃখ জড়িয়ে আছে ; তার ভালবাসা, ত্যাগ আর মহত্ত্বের সঙ্গে আমারও মহত্ত্ব। সে ছোট হলে আমিও ছোট, সে বড়ো হলে আমিও বড়ো।

আমি 'কুম্‌কী' কখনো দেখিনি, কিন্তু সে দেখেছে বলে আমিও দেখেছি। তার 'মুন্নী'কে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ করেছে বলে আমিও প্রত্যক্ষ করেছি। তার 'জুবেদা' আমার স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্তু সে তাকে ভালবেসেছিলো বলে আমারও সমান টান পড়ে গেছে তার ওপর। তার বলা কাহিনী যেন আমারই কাহিনী ; নইলে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে এমন ঝংকার তুলে বেজে-উঠবে কেন ?

আব্বাসী আমাকে যেখানকার কথা বলেছিল, সে-জায়গাটা আমার জানা হলেও, তাকে আমি তখন ও-অঞ্চলে দেখিনি। আমি তাকে যখন দেখেছি, তখন সে অন্যত্র থাকে। ধরুন, একটি লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো জলাইগুড়িতে, যে আপনাকে বললে—জয়ন্তী পাহাড়-অঞ্চলে গেছেন?

আপনি বললেন—হ্যাঁ।

সে তখন বললে—ও-অঞ্চলে আমি একদিন-আধদিন নয়, সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর ছিলাম।

এবং তারপরেই সে বলতে শুরু করল তার ফেলে-আসা তিরিশটি বছরের কাহিনী। শুনতে শুনতে জয়ন্তী পাহাড়ের চিত্র কি স্পষ্ট হয়ে আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবে না?

আমারও তাই হয়েছিল। আব্বাসীর সঙ্গে দেখা হলো মহীশূরে, আমাকে সে বলতে লাগল গুডালুর অঞ্চলের কথা। শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, ও-অঞ্চলটাতো আমার জানা! আমি কর্মব্যপদেশে একবার নীলগিরি গিয়েছিলাম। মাদ্রাজ-প্রদেশের প্রসিদ্ধ শৈলাবাস 'উটি' বা 'উটকামণ্ড্'। সেই উটকামণ্ড্ থেকে নেমে প্রবেশ করা যায় মহীশূরের বিস্তীর্ণ অরণ্যে। প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে আসা যায় গুডালুর অঞ্চলের প্রান্তে। 'উটকামণ্ড্' থেকে উৎসাহী দর্শনার্থীর দল বিকেলের দিকে মোটর-যোগে যায় গুডালুরে, সন্ধ্যা হতে-না-হতেই গিয়ে পৌঁছয়। তারপরে চলে যায় হাতীর পিঠে চড়ে বন-ভূমির অভ্যন্তরে। হরিণের দল দেখে, বাইসন দেখে, আর দেখে চিতাবাঘ। কখনো-কখনো বুনো হাতীর দলও চোখে পড়ে দূর থেকে।

আমি যাদের কথা বলতে বসেছি, তাদের অবস্থান ছিল গুডালুর থেকে আরও মাইল দশেক দূরে, আরও পশ্চিমে। ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন কর্ণাটদেশ বলা যেতে পারে। এবং সত্যিকথা

বলতে কী, আব্বাসীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, সেই প্রাচীনযুগে কর্ণাটদেশেরই কোনো এক প্রান্তে বসে—শুনে চলেছি এক সকরুণ সঙ্গীতের সুর—প্রাচীন কর্ণাটরাগ!

প্রাচীন কর্ণাট দেশে হস্তী-শিকারের এক বিশিষ্ট প্রথা ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, এই প্রথা থেকেই নাকি কর্ণাটরাগের সৃষ্টি। রাজপুত-রাজারা যেমন একটা সময়ে যেতেন মৃগয়ায়, তেমনি কর্ণাটদেশের রাজা বেরুতেন বিশিষ্ট মৃগয়ায়—হস্তী-শিকারে। বিপুল ছিল তার সমারোহ। পোষা হাতীকে নানান বর্ণে বিভূষিত করে, নানান আভরণে হ্যতিমান ক'রে সাজিয়ে রাজা উঠতেন রত্নখচিত সুদৃশ্য হাওদায়। সঙ্গে চলেছে তীর-ধনুক, বর্শা আর তরবারি নিয়ে বাছাবাছা সৈনিক। রাজার সঙ্গে হস্তী-শিকারে যাওয়াটা ছিল বিশেষ সম্মানের। চলেছে সৈন্য—গজারোহণে অথবা পায়ে হেঁটে। আর চলেছে অগণিত অনুচরবৃন্দ, চলেছে সুদক্ষ শিকারীর দল, চলেছে শিবিকারোহণে সুন্দরী নর্তকী আর রাজসঙ্গিনীরা, চলেছে বাদ্যযন্ত্রী, চলেছে সুকণ্ঠ চারণ-সম্প্রদায়!

অগ্রদূতেরা চলে গেছে আগে, পাত্রমিত্র-সৈনিক-অনুচর নিয়ে রাজা চলেছেন পিছনে-পিছনে, হঠাৎ ফিরে এলো এক দূত। তাকে দেখেই থেমে গেল সমস্ত দলটা, থেমে গেল সমস্ত হৈ-হল্লা আর বাদ্যভাণ্ডের ধ্বনি-তরঙ্গ। জানা গেল হাতীর সন্ধান। দূতের নির্দেশে, রাজা ও শিকারী-সম্প্রদায় অনুচর-সহ চারিদিক থেকে বনাটকে ঘিরে ফেললেন কিছুক্ষণের মধ্যে। হাতীরা দলবেঁধেই চলাফেরা করে, কিন্তু কখনো-কখনো এমন হয় যে দিশা হারিয়ে একটি হাতী দল থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চিতাবাঘের মতো মানুষ তখন তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সুযোগে। দূত এসে সেই সুযোগের কথাটাই বলে গেল। তারই নির্দেশ-অনুযায়ী এমনভাবে অরণ্য-বেষ্টন করা হলো যে দিশাহারা হাতীটি দল থেকে

একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। তারপরে, তাকে নিয়ে তাড়িয়ে বেড়ানো হলো কিছুক্ষণ, অবশেষে সে ধরা পড়ল বেষ্টনীর মধ্যে। এইবার তাকে অস্ত্রাঘাত করা চলতে লাগল চতুর্দিক থেকে। আহত জীবটি উন্মত্তের মতো ছুটতে লাগল এদিক-ওদিক। কিন্তু, কোথায় সে যাবে? চারিদিকে তার মানুষ আর মানুষ! চারিদিক থেকে ছুটে আসছে তীক্ষ্ণ তীর আর বল্লম। সমস্ত দেহ থেকে রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে, হয়তো বা চোখদুটি অন্ধ হয়ে গেছে, শুঁড়টা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, চারটি পা-ই ক্ষতবিক্ষত,—থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় সে শুয়ে পড়ল। এবং সেই যে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। সুদক্ষ কয়েকজন অনুচর এগিয়ে এসে একটি গজদন্ত কেটে নিলো সবার আগে, সেটি নিয়ে এসে একটি সোনার থালায় বসিয়ে তুলে দিলো রাজার হাতে। রাজ-সঙ্গিনীরা তখন এগিয়ে এলো নূপুরসিঞ্জিত পায়ে,— রাজার কপালে পরিয়ে দিলো জয়টিকা। আর তারপরেই সুকণ্ঠ চারণের দল চারিদিক থেকে রাজাকে ঘিরেদাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলো রাজার প্রশস্তি। সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বলেন, এই গানের সুর থেকেই কর্ণাট রাগের সৃষ্টি!

গানের সুরে থাকত দুটি ভাব। একটি হচ্ছে, নিহত জীবটির শেষ নিঃশ্বাসের করুণ ভাব,—অপরটি হচ্ছে, সার্থক মৃগয়ার উল্লাস ধ্বনি।

গুডালুরের নিকটবর্তী মহীশূর-অরণ্যের অভ্যন্তরে আজও হাতী-ধরার জন্য 'খেদা'র বব্যস্থা হয় মাঝে মাঝে; তার জন্য শিক্ষিত মাহুত, শিকারী আর 'কুম্‌কী'র সমারোহ প'ড়ে যায়। হিংস্র দাঁতালো হাতী অথবা পাগলা হাতীর উপদ্রবের জন্যও হাতী-শিকার করা হয় কখনো-সখনো। অরণ্যবাসী জংলীদের মধ্যে উল্লাসও দেখা দেয় প্রচণ্ডরূপে। শিকারীকে তারা উপহারও এনে দেয় নানারকম, কিন্তু যা' আজকাল আর হয় না, সে হচ্ছে সেই প্রাচীন চারণ দলের

কর্ণাটরাগের গান। সে গান আজ অরণ্য থেকে উঠে এসেছে জনপদে—সঙ্গীত-পিপাসুদের অভিজাত-মণ্ডলে।

কিন্তু, যা' বলছিলাম। এই 'খেদা'র সৃষ্টি ক'রে হাতীধরার কাহিনী, কিম্বা হিংস্র পাগলা হাতী শিকারের কাহিনী, এ-সবই আমি শুনছিলাম মহীশূর শহরের অনতিদূরে কৃষ্ণরাজ সাগরের বাঁধের পোল পেরিয়ে যে বিখ্যাত বৃন্দাবন-উদ্যান বিরাজমান,—তারই এক প্রান্তের এক কুটিরে বসে, অথর্ব আব্বাসীর কাছ থেকে। শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে থেকে বৃন্দাবন-উদ্যানের রঙীন জলের ফোয়ারা মিলিয়ে গেল, ভেসে উঠ্‌ল মহীশূরের গহীন অরণ্য, 'উটকামণ্ডের' সিন্‌কোনা-ইউক্যালিপ্‌টাস-ঝাউয়ের সারি পেরিয়ে চল্লিশ মাইল এসে গুডালুর, আবার সেখান থেকে আরও দশ মাইল পেরিয়ে গহন বনের প্রত্যন্ত সীমানায় জংলীদের গ্রাম, আর সেই গ্রামের এক অখ্যাত ডাকবাংলো। তারই পটভূমিকায় নিহত হাতীটি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তাকে ঘিরে শোনা যায় জংলীদের উল্লাসধ্বনি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অশ্রুত রাগের আলাপনও শ্রুত হচ্ছে,—সে হচ্ছে কর্ণাটরাগ!

চারণেরা ছিল রাজভৃত্য, তাই মৃগয়া-বিজয়ী মহারাজের জয়গান গাইতে তারা বাধ্য,—কিন্তু, তাদের অন্তরনিঃসৃত যে স্বাভাবিক সঙ্গীত প্রথমেই ধ্বনিত হয়ে উঠত তাদের কণ্ঠে,—তা ছিল নিহত হাতিটির অন্তিম সময়ের সকরুণ সুর-আশ্রয়ী। সেই নিস্পন্দ নিথর দেহ, সেই নিষ্পলক পাণ্ডুর দৃষ্টি, সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মৃদু কম্পন,—তারই নিবিড় বেদনা বুঝি সবার আগে রূপ পরিগ্রহ করে গেছে তাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত লহরীর মধ্যে!

আব্বাসীর জীবন-কাহিনীর সঙ্গে এই সঙ্গীত-মূর্ছনার যে একটা অদ্ভুত ভাবগত মিল আছে, সেটা ওর কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। হ'তো না, যদি-না ঘটনাক্রমে

কর্ণাটরাগের ইতিকথা আমার জানা না-থাকতো। সে ঘটনাক্রমটা অবশ্য অন্য, এ-কাহিনীর সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। বাইরে বাইরে চাকরী নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর আগে এই শহরেই ত' আমার দিন কেটেছে। এই শহরেই ত' লেখাপড়া করেছি, এই শহরেই ত' শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। তখন আমরা ভাড়া থাকতাম শহরের এক উপকণ্ঠে। বোধহয় কলেজে তখন ভর্তি হয়েছি, দিনে আর রাতে ছেলে পড়িয়ে বেড়াই,—এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া এলেন এক ভদ্রলোক; নিজে বৃদ্ধ, সামান্য পেন্সন পান, একমাত্র ছেলে—সে চাকরী করে, আর একটি মাত্র মেয়ে, সে অন্ধ; বিয়ে তার হয়নি, বাপের কাছে বসে বসে গান শেখে। গান নিয়ে পিতাপুত্রী মেতে থাকত; গানের ব্যাপারে নানান্ পুঁথিপত্রও সংগ্রহ করার বাতিক ছিল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের। সঙ্গীতে কে না আকৃষ্ট হয়? আমরাও আকৃষ্ট হতাম। অবসর পেলেই গিয়ে বসতাম বৃদ্ধের দরবারে। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম কর্ণাটরাগের কথা। তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকও লিখে দিয়েছিলেন আমাকে; তাতে কৃপাণ-পাণি ক্ষিতিপাল মূর্তির বর্ণনা ছিল। বলতেন—কর্ণাটরাগেরই পরবর্তী রূপ—কানাড়া।

'কানাড়া' বা 'ক্যানারীজ' হচ্ছে আব্বাসীর মাতৃভাষা। এতে ক'রে বেশ বোঝা যায়, সে নিজে 'কানাড়া' বা 'কর্ণাটদেশ'-এর লোক। কিন্তু, উর্দু মিশ্রিত হিন্দী বলে পরিষ্কার। তার কথাবার্তা আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে, কিন্তু তার সেই থেমে-থেমে, টেনে-টেনে হিন্দী বলার ধরনটা যদি মুখস্থ রাখ্তে পারতাম, তা'হলে বোধ হয় আরও ভালো হতো! সে বলত,—বাবুজী, কিস্মৎকা ঠোকর, নঁহি তো কাঁহা হুঁ ম্যয়, ঔর কাঁহা হৈ গুডালুর।

'আব্বাসী' নামটা হচ্ছে মুসলমানী। কিন্তু সে মুসলমান নয়, হিন্দু। রোগা, জীর্ণ চেহারা। নিজেকে সে পরিচয় দিয়েছিল 'অথর্ব' ব'লে। বয়স ছত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে;

—সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। বয়স জিজ্ঞাসা করলেই আব্বা একটু হাসত ; বলত,—যে ফুলটা বোঁটা থেকে আল্‌গা হয়ে গেছে, তার আবার উমরের হিসাব কী? একটু আঁধি লাগলেই ত' ব্যস,—টুপ্‌ ক'রে ঝরে পড়বে।

আব্বাসীর একটা পা ছিল কাটা। কাঠের ক্র্যাচে কোনরকমে ভর দিয়ে একটু-আধটু চলাফেরা ক'রত। এবং ঘটনাক্রমে এই 'ক্র্যাচ-এর ব্যাপার নিয়ে আলাপ হয়ে গিয়েছিল আব্বাসীর সঙ্গে। ঠিক কর্মব্যপদেশে নয়, বেড়ানোর নেশা আমার আবাল্য, তাই অতিকষ্টে কিছু পয়সা জমিয়ে রেলওয়ের কন্‌সেশনের সুযোগ নিয়ে সেবার বেড়াতে গিয়েছিলাম দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশে। একাই ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলাম মহীশূর শহরে। রাত্রে রাজপ্রাসাদের দীপাবলী দেখলাম, আর পরদিন সকালে গেলাম চামুণ্ডি-পাহাড় ঘুরে অবশেষে কৃষ্ণরাজ সাগর দেখতে। কাবেরী নদীর প্রকাণ্ড বাঁধ। একাশী কিম্বা বিরাশীটি স্লুইস্‌-এর সেই বিরাট বাঁধের ওপরকার সেতু দু'আনা দক্ষিণা দিয়ে পার হতে হয়েছিল। পরপারেই হচ্ছে মহীশূরের বিখ্যাত 'বৃন্দাবন উদ্যান'। এর অপূর্ব পরিবেশ আর লাল-নীল-হল্‌দে—নানারঙের জলের ফোয়ারা যে ময়াজাল সৃষ্টি করে, তার দৃশ্যাবলী মনটাকে এমন টানলে যে, যে-ক'দিন মহীশূরে ছিলাম, রোজই যেতাম বৃন্দাবন-উদ্যানে বেড়াতে। দেশে ফিরে আবার ত' শুরু হবে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া—খাড়া-বড়ি-থোড়-এর জীবন, আবার ত' শুরু হবে সেই সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরে আসা, নিত্য নৈমিত্তিক সেই রোজকার —পেটের ধান্দা! চোখ-কান-বুজে তাই ক'দিন যাবৎ পড়ে রইলাম মহীশূরে। আমি তীর্থ বুঝি না, মন্দির-স্থাপত্য বুঝি না ; যা সবাই বোঝে, আমিও তাই বুঝি। সৌন্দর্য। সৌন্দর্য মানুষের মনকে টানতে বাধ্য। বৃন্দাবন-উদ্যানের সৌন্দর্যই আমাকে টেনে রাখলো

ক'দিন ধরে। আমার মতো লোকের পক্ষে ও-ধরনের ভ্রমণ হচ্ছে বিলাসের নামান্তর ; তবু বুভুক্ষুর মতো এ-বিলাসটুকু আমি উপভোগ না ক'রে আর পারলাম না।

কয়েকজন মালীকে দেখতাম উদ্যানের মধ্যে ইতস্ততঃ কাজ করে বেড়াচ্ছে। আমাকে দিন কতক ধ'রে রোজই আসতে দেখেছে ব'লে আমার সম্বন্ধে ওদের ঔৎসুক্য জেগে ওঠা স্বাভাবিক। একদিন থাকতে না পেরে একটি লোক আমাকে প্রশ্নই করে বসল। মাতৃভাষাতেই সে কথা বলেছিল সর্বপ্রথম, আমি তার একবর্ণও বুঝিনি। সে তখন ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথা বলতে শুরু করল। তার প্রথম প্রশ্নই ছিল,—বাবুজী কোন্ দিককার লোক ?

—বাঙ্‌লাদেশের।

বলেছিল,—রোজ রোজ বাগানে আসেন, বাগানটা খুব ভালো লেগেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

উজ্জ্বল হয় উঠেছিল লোকটির দু'টি চোখ। বলেছিল—আমি এখানকার মালী। ঐ যে বাগানের প্রান্তে কুঁড়েঘর দেখছেন, ওখানে আমার বাসা।

—কী নাম তোমার ?

বললে—আপ্পা।

আপ্পাকে রোজই দেখতাম, কাজকর্মে সে নিবিষ্টচিত্ত। আমাকে দেখতে পেলে মুখ তুলে অল্প একটু হাসতো। দিব্যি জোয়ান চেহারা, মুখখানিতে অদ্ভুত এক ছেলেমানুষী লুকিয়ে আছে। আমি বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে এটাই লক্ষ্য ক'রেছি, সব দেশেরই সাধারণ লোকেরা মোটামুটি ভালো। সাধারণ লোক, অর্থাৎ যারা মাটির মানুষ —যারা স্কুল-কলেজে পড়েনি অথচ জীবনের পাঠ নিয়েছে। এরা হৃদয়ের সহজ ধর্ম মেনে চলে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এরা ভালবাসতে

জানে। সংকোচ আর ভয় এদের দূরে রাখে শুধু। সেটা ওদের কাটিয়ে উঠতে দেওয়া যাক, ওরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেবে। হৃদয়ের ভাষা হৃদয় যতো সহজে বোঝে, এমন আর কিছু নয়। কিন্তু যারা স্কুল-কলেজ উত্তীর্ণ হয়ে আত্মাভিমানকে আশ্রয় ক'রেছে, তারা বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা যতোটা করে, হৃদয়বৃত্তির চর্চা ততটা নয়। সেই জন্য তাদের কাছে হৃদয়ের সাড়া পাওয়া সহজ নয়। লেনিন কি বুদ্ধিজীবী সমাজকে সেই জন্যই উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন!

কিন্তু, যাক সে কথা। একদিন চোখে পড়ল, একটি লোক ক্র্যাচে ভর দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ পড়ে গেল। কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, ছিলাম আমি। তাড়াতাড়ি উঠে তুলে ধরলাম ওকে। রীতিমতো হালকা শরীর, জীর্ণ এবং শীর্ণ চেহারা। তদুপরি একটি পা কাটা। তার ক্র্যাচ্‌টা তুলে তাকে দিতে গিয়ে দেখি, একটি ক্র্যাচ্ একেবারে ভেঙে গেছে বেচারীর। সেই ভাঙা ক্র্যাচে ভর দিয়ে লোকটির পক্ষে আর একটি পা-ও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

ব্যথা লেগেছিল লোকটির পায়ে, চোখে তার জল এসে গিয়েছিল। একটু সামলে নিয়ে সে বললে—বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া বাবুজী।

বুঝলাম, হিন্দী জানে লোকটি। আমি নিজে যে হিন্দী-বিশারদ এমন নয়, কিন্তু এদেশে অল্প-অল্প ভাঙা হিন্দী কেউ বললেই আমরা তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। ব'ললাম—থাকো কোথায়?

সে হাত দিয়ে উদ্যানপ্রান্তের একটা কুঁড়েঘর দেখালো।

বললাম—তুমি ত' চলতে পারবে না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি?

পৌঁছে দিতে গিয়ে যখন দেখলাম, কুঁড়ে ঘরের সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপ্পা, তখন বুঝতে বাকী রইল না, এই ভগ্নস্বাস্থ্য খঞ্জ লোকটি আপ্পারই কেউ হবে।

আপ্পা ছুটে এলো। লোকটিকে তাড়াতাড়ি ধরে বললে—চোট লাগে নি ত?

বললাম—না। তবে একটা ক্র্যাচ্ ভেঙে গেছে।

একটি খাটিয়ায় লোকটিকে সে বসিয়ে দিলে। আর আমার দিকে টেনে দিলে একটা চৌপায়া। বললে—আপনি বসুন বাবুজী।

লোকটি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বললাম—এ-তোমার কে, আপ্পা?

—ভাই।

—ক্র্যাচের কী হবে?

আপ্পা একটু ভেবে বললে—আরেকটা তৈরী করে দিতে হবে। না হলে, দাদার খুব কষ্ট হবে।

—তোমার দাদা—অর্থাৎ বড়ো ভাই?

—হ্যাঁ।

লোকটি বললে—হ্যাঁ বাবুজী, আমি ওর বড়ো ভাই। আমার নাম—আব্বাসী।

শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম। আব্বাসী সাধারণতঃ মুসলমানদেরই নাম হয়, অথচ বলছে, আপ্পার ও ভাই।

আপ্পার নাম শুনে ত' মনে হয়—ও হিন্দু।

সেদিন আর কথা হ'লো না; হ'লো পরদিন। শুধু আলাপই নয়, অন্তরঙ্গতাই বলা চলে। আব্বাসীর পরণে থাকে 'চোস্ত্' জাতীয় পা'জামা আর ফতুয়া। আপ্পার মতো সার্ট আর লুঙ্গীর-মতো-ক'রে-পরা ধুতি নয়। আপ্পা তখন বাসায় ছিল না, বাগানে কাজ করছিল কোথাও। ব'ললাম—একা-একা বসে আছো, আর কেউ নেই?

আব্বাসী খাতির করে আমাকে বসতে দিলে। বললে—না বাবুজী, আর কে থাকবে? আমরা দুটি ভাই ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই আমাদের। আপ্পাকে বলি, বিয়ে কর, বউ আন। তা' সে-কথা সে কানেও তোলে না।

—কেন ?

আব্বাসী ম্লান হেসে বললে,—পাছে বউ এসে তার দাদাকে কোনো কষ্ট দেয় !

তারপরে একটু থেমে সে বলতে লাগল,—ভাইয়ের ওপর ভাইয়ের এ-রকম 'প্রীত' আপনি কখনো দেখেছেন বাবুজী ? তাই ত বলি, আমার আজ কোনো কাজ নেই, বসে বসে আমার অন্তেকাল-এর দিন গুন্‌ছি শুধু। আমি গেলে আপ্পা বাঁচবে। মরা মানুষকে নিয়ে কেউ কী থাকতে পারে বাবুজী ?—আমিত মরা মানুষ।

একা একা চুপচাপ বসে থাকে, কথা বলার লোক পেয়ে ও-বুঝি বেঁচে গেছে ! আমি আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গ আমার ভালো লাগে। সেদিন থেকে আব্বাসীদের কথাবার্তা আমার খুব ভালো লাগছিল। বলে উঠলাম,—কেন ? ও-কথা ব'লছ কেন ?

আব্বাসী বললে—শুনবেন তা'হলে ? আমাদের কহানী ভালো লাগবে ?

লাগবে। তুমি বলো আব্বাসী।

ও আবার একটুক্ষণ থেমে রইল। চোখ দুটি নীচু, মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে এক সময় ও বলতে শুরু ক'রল, —ছোটবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম বাবুজী। লেখাপড়ায় মন ছিল না, মা খুব মারধোর করত। গিয়ে পড়লাম এক মুসলমান মাহুতের কাছে। এই 'মাইশোরেই'। এমন কিছু বিশেষ ঘটনা নয়,—কাজ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ-ই একদিন আশ্রয়-পাওয়া। দীন মহম্মদ সাহেব আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি আমাকে ক্রমে ক্রমে মাহুতের সব কাজই শিখিয়েছিলেন। কাজটা খুব সহজ নয়, হাতীদের মর্জি ঠিক ঠিক সমঝে চলা। ওরা জানোয়ার, ওদের মর্জিও তেমনি। বিশেষ ক'রে 'কুম্‌কী'গুলো বড্ড অভিমানী হতো।

বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম—'কুম্‌কী' মানে ?

আব্বাসী বললে—পোষ-মানা মেয়ে-হাতী—যারা খেদায় গিয়ে বুনো হাতীকে বশ ক'রে ধ'রে নিয়ে আসে, ওদিককার লোকে তাদেরই বলে,—'কুম্‌কী।'

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। —আব্বাসী বললে,—এম্‌নি এক 'কুম্‌কী' ছিল জুবেদা; দীন মহম্মদ সাহেব তাঁর 'অন্তেকাল'-এর আগে ওকে নিজের হাতে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। উনি আমাকে ডাকতেন 'আব্বাসী' ব'লে; সেই থেকে হিন্দু হয়েও আমি সবার কাছে—আব্বাসী।

—মুসলমান হও নি তা'হলে ?

ও অল্প একটু হাসল। বললো,—হলেই বা ক্ষতি ছিল কী ? গরীবের আলাদা কোনো জাত নেই; হিন্দু গরীবও যা', মুসলমান গরীবও তাই। জাত দরকার পুঁজিওয়ালাদের, 'পুঁজি' রাখবার জন্য যাদের নানান্‌ ফন্দী-ফিকির খুঁজতে হয়।

কথাটা শুনে অবাক্‌ না হয়ে পারিনি। এতো সহজে এতোবড়ো সত্যি কথাটা ও ব'লে ফেলবে,—এ-যেন ধারণাই ছিল না। পরে ভেবে দেখলাম, ওর পক্ষেই ত' এ-উপলব্ধির বাণী উচ্চারণ করা স্বাভাবিক। আমরা আত্মাভিমানী বই-পড়া মানুষ,—আমরা এ-সত্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করব কেমন করে ?

আব্বাসী ততক্ষণে বলে চলেছে,—'কুম্‌কী' জুবেদাকে নিয়ে আমি থাকতাম গুডালুরের কাছে। গুডালুর চেনেন বাবুজী ?

বললাম—চিনি। 'উটি' থেকে মোটরে ক'রে চল্লিশ মাইল নামতে হয়,—তাই না ?

আব্বাসী বললে—তা হবে বাবুজী; রাস্তাটা আমি চিনি না, আমাদের চেনা রাস্তা যেটা, সেটা ধ'রে এই 'মাইশোর' থেকেই যেতে হয়। তবে, ঠিক গুডালুর নয়, গুডালুর থেকে আরও মাইল দশেক

পশ্চিমে, জঙ্গলের একধারে, জংলীদের গাঁয়ের কাছে। সেখানে আমি থাকতাম জুবেদাকে নিয়ে।

এইখানে একটু থামল আব্বাসী। তারপর তেমনি ধীর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল,—না বাবুজী, কথাটা ভুল বলা হলো। জুবেদাকে নিয়ে আমি থাকতাম, মানে জুবেদা ওখানকার হাতি-শালাতেই থাকতো বটে, আমি ছিলাম তার খিদমদগার,—মাহুত। রোজ ছুটিবেলা খবরাখবর করতাম, গোসল করাতে নিয়ে যেতাম, খানা দিতাম, ডলাই-মলাই করতাম। তারপরে, 'খেদা'র ডাক যখন পড়ত, তখন ওকে নিয়ে আর সব 'কুম্‌কী' আর মাহুতদের সঙ্গে মিলে বেরিয়ে পড়তাম জঙ্গলে। কতো দূর-দূর জঙ্গলে যে যেতে হতো, তার ঠিক নেই। হাতীর পালের মর্জির কী ঠিক-ঠিকানা আছে? কখনো নামল জঙ্গলের এ-ধারে, কখনো ও-ধারে। জঙ্গল থেকে বহুৎ বহুৎ বুনো হাতী ধরেছি বাবুজী; বহুৎ হাতীকে নিজের রঙ্‌ঢঙের 'লালচ' দেখিয়ে পিছনে-পিছনে টেনে আনতো জুবেদা। আমাদের লোক থাকত; তারা সময় বুঝে পোষা হাতীর পিঠ থেকে নেমে গিয়ে সেই বুনো হাতীদের পিছনের পায়ে শক্ত দড়ির বাঁধন বেঁধে দিতো দু'পাশ থেকে—চক্ষের নিমেষে। কখনো-সখনো আমি নিজেও নেমে গিয়ে সে কাজ করেছি। ও আবার থামল। এবং থামল দেখেই বলে উঠলাম,—আচ্ছা, এই নতুন হাতীগুলো হ'তো কাদের?

আব্বাসী বললে—কাদের আবার!—রাজার। ও-তো রাজারই ব্যবসা ছিল, এখন গভর্ণমেন্টের হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—শুধু জুবেদাই বুঝি ছিল তোমার নিজের?

আব্বাসী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপরে বললে,—না বাবুজী, জুবেদা কেন, সব 'কুম্‌কী' আর সব হাতীই ছিল রাজাবাহাদুরের। আমরা ছিলাম খিদ্‌মদ্‌গার—মাহুত। আমি

ছিলাম ছোট থেকেই জুবেদার মাহুত। জুবেদাকে ধরা হলো, সে-ও ত' আমার চোখের সামনে।

বলতে বলতে আব্বাসীর চোখ দুটিতে যেন স্বপ্নের ছায়া নামল। আমি যে এক বিদেশী তার কাছে বসে আছি, সে নিজেও যে বসে আছে ভাইয়ের বাসায়, বৃন্দাবন-বাগের এক উপান্তে,—সব যেন সে মুহূর্তে ভুলে গেল। তার চোখের সামনে তার জুবেদাই যেন মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে!

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতোই বলতে লাগল আব্বাসী,—দীন মহম্মদ সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি তখন ছোট। আমি তখন ছিলাম খেদার হাতীদের সঙ্গে, অর্থাৎ যারা খবরদারী করবে, চারিদিক বেড় দিয়ে হাতী তাড়িয়ে নিয়ে আসবে, তাদের দলে। কোনো 'কুম্‌কী'র পিঠে আমি ছিলাম না সেদিন। কী ক'রে থাকব? হাতীদের মর্জির ব্যাপার আমি তখন আর কতটুকু জেনেছি? 'কুম্‌কী'র পিছনে-পিছনে যখন বুনোহাতী পাগলের মতো ছুটে আসতে থাকে, তখন 'কুম্‌কী'র কাঁধের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকা সহজ নাকি? সহজ নাকি 'কুম্‌কী'কে ঠিক মতো চালনা ক'রে নিয়ে যাওয়া?

এখানে আবার একটু থামল আব্বাসী। তারপরে তেমনি ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে বললে,—বাবুজী, এসব ব্যাপারে হাতীদের সঙ্গে মানুষের আমি তফাৎ দেখতে পাই না! আপনার কাছে বলতে সরম লাগে বাবুজী, 'জওয়ানী'র রঙ্-ঢঙে ভুলে পুরুষ মানুষও যখন তাকে পাবার জন্য 'দিওয়ানা' হয়ে যায়, তখন সে-ও ঐ 'কুম্‌কী'র-পিছনে-ছোটা হাতীর মতোই 'দিমাগ' হারিয়ে ফেলে। তখন তার চারদিকে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, কে কী বলছে না-বলছে, কোনোদিকে আর মন দিতে পারে না।

বললাম,—কথাটা ঠিক। কিন্তু,—

বাধা দিয়ে আব্বাসী বলে উঠলো,—বুঝেছি বাবুজী। ভাবছেন, যে-লোকটা জিন্দিগী-ভোর জঙ্গলে কাটালো, সে মানুষের কথা এতো জানলো কী ক'রে? তাই না?

একটু থেমে, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে আব্বাসী বললে,—জেনেছি বাবুজী, জঙ্গলে 'কুম্‌কী'ও আছে; আওরৎ-ও আছে; বুনো হাতীও আছে; বুনো হাতীর মতো পুরুষও আছে।

ওর কথার মধ্যে বহু কথারই ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু সবটা ধরতে পারি নি। তাই আরও একটু স্পষ্ট করে জানবার জন্য বলে উঠলাম,—জঙ্গলে ত জংলীদের বাস!

—হ্যাঁ বাবুজী,—আব্বাসী বলতে লাগল,—জঙ্গলে জংলীরা আছে, মাহুতরাও আছে—কিন্তু তারা তো খেদার লোক বাবুজী, তারা বুনো হাতী ধরতে বেরোয়। তাদের কাজে তারা নিজেরা 'বুনো' হয় না।

বলেই অল্প একটু হাসলো আব্বাসী। বললে,—আমরা জঙ্গলের লোকদের 'জংলী' বলি, 'বুনো' বলি; তারা কিন্তু 'জংলী' বলে, 'বুনো' বলে আমাদের। 'আমাদের' কথাটা বলাও ভুল হ'লো। কারণ, আমি তো ছোট থেকেই তাদের মধ্যে কাটিয়েছি, তাদের জঙ্গলের মধ্যে। আর যে-সব মাহুত,—দীন মহম্মদ সাহেবের কথাই বলুন, আর যার কথাই বলুন—তারাও জঙ্গলে থাকতে থাকতে 'জংলী' হয়ে গেছে। কথাটা অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখুন। জংলীদের চোখে, জঙ্গলে থাকতে থাকতে তারা 'সভ্য' হয়ে গেছে। কিন্তু, যারা কোটপ্যাণ্ট্-পরা লোক, দু'দিনের জন্য বাইরে থেকে ওখানে গেছে ওখানকার ডাকবাংলোয় থাকতে,—তাদের ওরা 'সভ্য' বলে স্বীকার করে না, তাদের ওরা 'অসভ্য' বলে, 'জংলী' বলে। ঠাট্টা ক'রে বলে,—'বুনো হাতী'। মাঝে মাঝে এই সব সভ্য 'বুনো হাতী'রাই ধরা প'ড়ত কুম্‌কীর মতো 'জওয়ানী'দের রঙ্‌ঢঙের কাছে। তখন সেই সব কোট্-

প্যান্ট্-পরাদের সঙ্গে বুনো হাতীদের কোনো তফাৎ দেখতে পেতো না গাঁয়ের লোকেরা। চুপ ক'রল আব্বাসী—হঠাৎ-ই যেন চুপ ক'রল। আমার চিন্তার স্রোতও যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমিও কথা বলতে পারলাম না অনেকক্ষণ।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওদের ঘরেরই পিছন দিককার একটা গাছে পাখীর দল ফিরে এসে কলরব করছে। যেন একশো'টা বেহালা আর একশো'টা সেতারে ঝংকার উঠেছে—বিভিন্ন, পর্দায়, বিভিন্ন সুরে। কিছুটা দূরে লাল আগুন-রঙা শাড়ী প'রে কোনো এক আধুনিকা কোনো এক কোটপ্যান্ট্-পরার গায়ে ঢলে পড়ল খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে। তাদেরই কাছটাতে হলদে-লাল-নীল রঙের আলো জলের ফোয়ারার ওপরে প'ড়ে—আশ্চর্য এক রামধনুর সৃষ্টি করেছে। কোট্প্যান্ট্-পরা মানুষটি ভুলে গেছে তার পারিপার্শ্বিকের কথা, ভুলে গেছে যে, তাদের অনতিদূরেই কুটিরের সামনে আমরা বসে আছি চারপাইয়ের ওপর। আগুন-রঙা শাড়ীপরা মেয়েটাকে দু'হাতে টেনে নিয়েছে বুকের ওপরে,—কোনো দিকে তার আর ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখ ফিরিয়ে আব্বাসীর দিকে তাকাতেই তার চোখে চোখ পড়ে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে কী যে হলো, অপরাধীর মতো, লজ্জিতের মতো, অপ্রস্তুতের মতো তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ফেলে মাথাটা নীচু করে রইলাম।

আব্বাসী ধীর বিনম্র কণ্ঠে বললে,—হোটেলে ফিরবেন না বাবুজী! রাত হয়ে এলো।

মুখ তুললাম। বললাম,—তোমার জুবেদার কথা বলো; না শুনে যাচ্ছি না।

আব্বাসীর চোখ দুটো আবার যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, এমন করে আমাদের কথা তো কেউ শুনতে চায় না বাবুজী! এমন দিল দিয়ে বুঝতেও চায় না। আপনি বড়ো অদ্ভুত মানুষ দেখতে পাচ্ছি।

বললাম,—ওসব কথা থাক। তুমি তোমার জুবেদার কথাটা শেষ করো। খেদায় গিয়ে ওকে তো ধরলে, কিন্তু তার পর?

আব্বাসী বললে,—বড়ো-বড়ো খাড়া-খাড়া সব ঝাউগাছ। তার মধ্যে হঠাৎ-ই বেড় দিয়ে ওকে ধরা হয়েছিল। আর সবগুলো পালিয়ে গেল, ও তখন বাচ্চা বললেই চলে—ও আর পালাতে পারল না। ওকে ধ'রে নিয়ে আসা হলো। আর, সেই বাচ্চা জুবেদা আমার চোখের সামনেই বড়ো হয়েছে বাবুজী। আমারও বয়স বাড়তে লাগল ও-ও বড়ো হতে লাগল। আমরা দু'জনেই পাশাপাশি বড়ো হ'তো লাগলাম। আমি ওকে নিজের হাতে আখ খাওয়াতাম, নারকেল খাওয়াতাম। দীন মহম্মদ সাহেব বলতেন,—বেটা আব্বাসী, তোর জিম্মাদারীতেই দিলাম জুবেদাকে।...সেই থেকে জুবেদা আমার সঙ্গিনী। জঙ্গলে তারপরে কতদিন একা একা গেছি জুবেদাকে নিয়ে। কতো খেলা করেছি ওর সঙ্গে মাঠের মধ্যে! ও সত্যিই আমার বশ ছিল। এক-একদিন করতাম কী, একগাছি সামান্য সুতো ওর গলায় পরিয়ে ওকে একটা গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখতাম। বলতাম,—জুবেদা, তুই বাঁধা রইলি, একদম নড়বি না।

আমার তখন ছিল ভীষণ ঘুড়ি ওড়াবার শখ। সব সময় মাঞ্জা দেওয়া একরাশ রঙীন সুতো-গুটানো একটা লাটাই থাকতো আমার ঘরের দাওয়ার বাতায় গোঁজা। ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবার আগে ওকে বলতাম,—যা, আমার লাটাইটা নিয়ে আয় দেখি?

যেখানটায় লাটাইটা থাকত, একদিন মাত্র ওকে চিনিয়ে দিয়েছিলাম জায়গাটা। হাতীর মনে রাখবার ক্ষমতার কথা আপনার শোনা আছে তো বাবুজী? কথাটা ঠিক। মনে যেটা ওদের একবার ঢুকল, সেটা আর সারাজীবনে ওরা ভুলবে না। লাটাই রাখবার জায়গাটা একদিনেই ও কিন্তু ঠিক চিনে নিয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে ঠিক লাটাইটা নিয়ে আসত। রফিক-চাচা বলে হায়দ্রাবাদী এক মাহুত ছিল, সে

ঘুড়ি তৈরী ক'রত বাড়ীতে বসে, আর বিক্রী করবার জন্য বাইরে পাঠাতো। আমি জুবেদাকে লাটাইয়ের জন্য পাঠিয়ে নিজে যেতাম রফিক-চাচার কাছে। রফিক-চাচার মেজাজ ভালো থাকলে এমনিতেই ঘুড়ি একখানা দিয়ে দিতো, মেজাজ ভালো না থাকলে বলতো,—পয়সা দিবি। এক পয়সায় একটা। তোর নামে খাতায় লিখে রাখলুম।

সত্যিসত্যি খাতায় লিখে রাখতো। আমি মনে মনে একটু হেসেই তার কাছ থেকে ছুটে চলে আসতাম। মনে মনে বেশ জানতাম, হিসাব ঐ খাতাতেই লেখা থাকবে, রফিক-চাচা তাগাদাও করবে না, আমারও শোধ দেওয়া হবে না। বলতে বলতে আবার একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো আব্বাসী। বললে,—রফিক-চাচার 'অন্তেকাল' হয়েছে বাবুজী। তার কাছে কতো ধার যে পড়ে রইল, আর শোধ করা হলো না!

গলাটা শেষের দিকে তার কেঁপে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিলে নিজেকে। একটু সোজা হয়ে বসল ও। তারপর বললে,—আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে না, বাবুজী?

বললাম—না, দেরী আবার কী? না হয়, শেষ বাস্‌টা ধ'রে ফিরব।

আব্বাসী বললে—জুবেদার কথা আর কতো বলব, বাবুজী? আমি রফিক-চাচার কাছ থেকে ঘুড়ি নিয়ে মাঠে যেতে-না-যেতেই দেখি, জুবেদা লাটাই গুঁড়ে করে নিয়ে আমার আগেই পৌঁছে গেছে মাঠে। যে-মাঠটা আমি ঘুড়ি ওড়াবার জন্য বেছে নিয়েছিলাম, ওটা বনের একেবারে ধারে, গাঁয়ের ছেলেপিলেরা ওদিকে বড়ো একটা যেতো না। দৈবাৎ ছু'-একটা লোক মাঠ ভেঙে পথ সংক্ষেপ করছে, এ-ছাড়া আর কাউকে সচরাচর দেখা যেতোনা বললেই হয়। তাই আমাদের খেলা দেখবার জন্য কেউ ছিল না, আমরা ছু'জনেই ছু'জনকে দেখতাম বলা চলে। মাহুতরা থাকে হাতীশালার লাগোয়া ঘরগুলিতে, আর একদিকে একটা ডাকবাংলো,—এ-ছাড়া গাঁয়ের আর ছিলই বা কী?

জংলীদের থাকার ব্যাপারটা কিন্তু অন্য ধরনের বাবুজী। এই মাঠের ধারে পাঁচ-দশ ঘর নিয়ে একটা বস্তী, আবার ধূ-ধূ মাঠ কিম্বা বন পেরিয়ে পাঁচ-দশ ঘর নিয়ে আরেকটা বস্তী। ওরা এই ভাবেই থাকে। তারপরে, হাতী দেখলে শহরের লোকেরা যেমন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, ওখানকার লোক তো সবসময়ই হাতী দেখছে, ওরা আর অবাক হবে কী! তাই আমাদের খেলার দিকে অন্য কারুর চোখ পড়ত না। তার ওপর আমি আবার ক'রতাম কী—সেই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে মাঠ পেরিয়ে বনের খানিকটা ভিতরে ঢুকে যেতাম। সেখানটা আবার ছোট্ট একটা মাঠের মতোই ফাঁকা। চারদিকে গাছপালার অন্ত নেই, মাঝখানটা বড়ো একটা উঠোনের মতোই পরিষ্কার, যেন আমাদের হু'জনের খেলবার জন্যই ও-জায়গাটা তৈরী করে রেখেছিল কেউ!···আমি ওর কাঁধে চ'ড়ে ওকে নিয়ে এখানেই চলে আসতাম। কিম্বা বলতে পারেন, ও-ই আমাকে এখানে নিয়ে আসত। জায়গাটা ওরও ছিল খুব পছন্দ। এখানে এসে, ওর কাঁধ থেকে নেমে পড়ে, ওকে ঐরকম খেলাচ্ছলে সুতোয় বেঁধে রাখতাম একটা গাছের নীচে। তারপর নিজের মনে লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতাম। আর, কী অবাক কাণ্ড বাবুজী, ও ঠিক চুপচাপ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকত! সামান্য সুতোর একটা বাঁধন!—যারা দড়ি-দড়া ছিঁড়ে ফেলে, সেই হাতীদের কাছে সুতোর বাঁধন আবার কী? কিছুই না। আসল কথা, ওটা ছিল আমার খেলা। কিন্তু, তাজ্জব ব্যাপার! সেই খেলাটাকেই অদ্ভুতভাবে মেনে নিয়েছিল জুবেদা। জানোয়ারদের হিংসেটা আমরা দেখি বাবুজী, মোহব্বৎটা দেখি না।

বলতে বলতে জীর্ণ এবং শীর্ণ মানুষটির চোখহু'টো ছল ছল ক'রে এলো হঠাৎ, গলাটাও ধরে এলো।

কিছুক্ষণ থেমে আবার সে শুরু করলে,—আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাই বাবুজী, আমি ঘুড়ী উড়াচ্ছি, আর একটা

ছোট ঝাউগাছের ডালের সঙ্গে মাত্র একটা সুতোয় বাঁধা আছে জুবেদা। সাদা সূক্ষ্ম সুতো, কখনো বা মাঞ্জা-দেওয়া বলে রঙীনও হতো,—চোখে ভালো ক'রে দেখা যায় না, আমি ছাড়া কারুর চোখে পড়বে কিনা সন্দেহ,—সেই সুতো বিয়ে-করা মেয়েদের 'মঙ্গল-শূত্রম্'-এর মতো গলায় জড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জুবেদা, মাঝে মাঝে শুঁড় দোলাচ্ছে, আর বড়ো-বড়ো কান খাড়া ক'রে কী যেন শুন্‌ছে।

"দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, আকাশে ফুটে উঠ্‌ছে একটা-দুটো তারা,—ঠিক এম্‌নি সময়ে শুঁড় তুলে ও ডেকে উঠতো। অতো বড়ো শরীরটা, কিন্তু গলার স্বর কী মিহি, কী সরু! হাতীর ডাক আপনি শুনেছেন তো বাবুজী? সেই সরু সুরে বসা গলায় ডেকে উঠে ও-যেন বলতে চাইত,—আর কেন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, খারাপ জন্তুজানোয়ার চলাফেরা শুরু করবে,—এইবার খেলা থামাও, আমার বাঁধন খুলে দাও, ফিরে চলো।

বোঁট্‌কা-গন্ধওয়ালা চিতে বাঘগুলো বড্ড বিশ্রী, হঠাৎ কোত্থেকে যে লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে তার ঠিক নেই! আমি ওর ভাষা যেন ঠিক বুঝতে পারতাম। আর, ও-ও যেন বুঝতে পারত আমার ভাষা। আমি ঘুড়ি গুটিয়ে হাতে নিয়ে হাঁক দিয়ে বলে উঠতাম,—জুবেদা, তুই চলে আয়।

সে কিন্তু আসতো না। নড়তো না এক পা'ও! বারকয়েক ডাকাডাকির পর শুঁড় তুলে সাড়া দিতো সেই রকম মিহি সুরে, অথচ সুতোর বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসত না। যেন বলতে চাইত,—বাঁধন খুলে দাও, নইলে যাবো কী করে?

বাবুজী, এটাই ছিল আমাদের রোজকার খেলা। এমনি করেই আমরা খেলা করতাম, দিনের পর দিন। সুতোর বাঁধন খোলা আর সুতোর বাঁধন পরানো।

জুবেদার কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে কিসের প্রতিক্রিয়া ঘটল কে জানে, ওকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা, করে ফেললাম—বিয়ে করো নি আব্বাসী—শাদী ?

একটু বুঝি চম্‌কেই উঠলো আমার প্রশ্নে, খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। তারপরে মুখখানা নত করল। রেখাকীর্ণ বিশুষ্ক মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ দেখাতে লাগল। অকালে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে মানুষের যেমন চেহারা হয়, আব্বাসীরও হয়েছে ঠিক তেমনি। অস্বাভাবিক শীর্ণ দেখায় চেহারাটা, হাতদু'খানি লম্বা হলেও, কাঠির মতো সরু। মুখখানা জুড়ে নানান্ রেখা অঙ্কপাত করে গেছে। কপালে রেখা, দু'টি চোখের কোণে রেখা, নাকের ডগার দুইটি পাশ ঘেঁষে দু'টি রেখা, নীচের ঠোঁট আর চিবুকের মধ্যবর্তী অংশেও রেখা। কান দু'টি একটু বড়ো-বড়ো। চোখ দু'টিও বড়ো এবং সময় সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

নিজেকে সামলে নিতে এবার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল আব্বাসীর। মুখ তুললো সে এক সময়। তেমনি ধীর বিনম্র কণ্ঠেই সে বললে,—বাবুজী, রাত হয়ে গেল, যারা বেড়াতে এসেছিল তারা সব ফিরে গেছে, আপনি এবার উঠুন, হোটেলে চলে যান। নইলে পরে আর বাস্ পাবেন না।

চম্‌কে, চারদিকে তাকিয়ে দেখি, কথাটা মিথ্যে নয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রীতিমত রাত্রি নেমেছে বলা যায়, সারা বৃন্দাবন-উদ্যানটাও নির্জন হয়ে গেছে। বললাম—আপ্পা কোথায় ? এখনো এলো না যে !

আব্বাসী বললে,—দোকান-বাজারে গেছে বোধ হয়। আপনি কিন্তু আসুন বাবুজী, আর দেরী করবেন না।

কথাগুলো অসঙ্গত নয়, কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছিল,—আব্বাসী আমাকে যেন জোর করে উঠিয়ে দিতে চাইছে তার কাছ থেকে। এবং চিন্তাটা মনে আসতেই একটা অদ্ভুত অভিমান যেন আমার

অন্তরটাকে ঘিরে ফেলল। আর একটি কথাও না ব'লে আমি নিশ্চুপে সরে এলাম ওর কাছ থেকে। রঙীন আলো তখনো জলের ফোয়ারার সঙ্গে আপন মনে খেলা করে চলেছে। যে-যার ঘরে ফিরে গেছে, কে দেখছে তখন আর ওদের খেলা? কিন্তু সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের, ওরা যেন নিজেদের নিয়েই বিভোর হয়ে আছে।

হাতে তখনো পাঁচ-সাত দিন ছুটী ছিল। তবু মনে হলো, আগামী প্রথম যে ট্রেণ পাবো, সেই ট্রেণেই ফিরে যাবো ঘরের ছেলে ঘরে,—আর এখানে নয়। কিন্তু রাত ভোর হলো, দিনের আলো ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠতে লাগল, 'উঠছি-উঠবো—যাচ্ছি-যাবো ক'রে যাওয়া আর হ'লো না। তার ওপরে, যতো বিকেল হয়ে আসতে লাগল, ততই যেন আমাকে অদৃশ্য দুই হাত দিয়ে টানতে লাগল বৃন্দাবন-উদ্যান। মনে পড়ল, 'বিয়ে'র কথায় গম্ভীর হয়ে গেল আব্বাসীর মুখ, 'বিয়ে'র কথা ওঠায় আর কিছু বলেও নি আব্বাসী; কিন্তু ওর এই না-বলার মধ্য দিয়ে যেন অনেক কথা—অনেক রহস্য উঁকি দিচ্ছে, যা' না-জানা পর্যন্ত আমার যেন শান্তি নেই—আমার যেন স্বস্তি নেই! নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমাকে হয়তো ও বলতে চায় না,—তবু আমার মন মান্‌ছে কই? সূর্য পশ্চিমে যতো ঢলে পড়তে লাগল, তত অস্থির হয়ে উঠতে লাগল আমার মন।

গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন ধবধবে সাদা পাজামা আর ফতুয়া প'রে তার সেই খাটিয়াটির ওপরে বসে আছে আব্বাসী—ঘরের সামনেকার দাওয়ার বাইরে। কাছেই চৌপায়াটি পাতা, তার সামনে টিপয়ের মতো ছোট্ট একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল। আপ্পা আমাকে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকেই, সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো আমার কাছে। বললে—আসুন বাবুজী, দাদা সেই দুপুর থেকে আপনার খোঁজ করছে। বলছে, বাবুজী গোঁসা ক'রে আজ যদি না আসেন! কোনো কথা না ব'লে অল্প একটু হাসলাম। আপ্পা বললে—দাদার

ভাঙা ক্র্যাচ্‌টা জোড়া দিয়ে নিয়ে এসেছি। কাঠের মিস্ত্রীদের দেমাক বড্ড বেশী, কাজে চট্‌ করে হাত দিতেই চায় না। অনেক ধরাধরি করে একজনের কাছ থেকে করিয়ে এনেছি শেষ পর্যন্ত।

আব্বাসী তার খাটিয়ার ওপর সোজা হয়ে বসল, বললে—আসুন বাবুজী, ডর হচ্ছিল এর মধ্যে ক'লকাতা ফিরে গেলেন নাকি!

বললাম,—না, ফিরে আর যাওয়া হলো কই? এলাম তোমার টানে।

আপ্পা ঘরের ভিতর থেকে দু'গেলাস সরবত্‌ নিয়ে এলো। বললে—আপনারা দু'জনে খান বাবুজী।

বললাম—এসব আবার কেন, আপ্পা?

আব্বাসী বললে—গোস্তাকী মাপ হয়, আজ বাবুজীর গরীবখানায় কিছু খেয়ে যেতে হবে। আপ্পার বড়ো ইচ্ছে। ও নিজে থেকে সব ব্যবস্থা ক'রেছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই রেখাঙ্কিত বিশুষ্ক মুখখানার দিকে। টের পেলাম, আপ্পা ধীরে ধীরে তার ঘরের ভিতরে চলে গেল। আব্বাসীর মুখে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ এক হাসির রেখা। সরবতের গেলাসের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে সে বলে উঠল,—খান বাবুজী।

খেলাম। কালকের মতো ধীর নিম্নকণ্ঠে ও বলে উঠল,—কাল যে-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবুজী, তার উত্তর দেওয়া কি আমার পক্ষে খুব সহজ? অথচ, কাল সারারাত.. আজ সারাটা দিন ছট্‌পট্‌ করে বেড়িয়েছি, কখন বাবুজী আসবেন, কখন বাবুজীকে সব আমি বলব? যে-কথা কোনদিন কাউকে বলি নি, সে কথা আপনাকে বলবার জন্যই বা মন এতো অস্থির হয়ে ওঠে কেন বাবুজী? এ-ও তো তাজ্জব ব্যাপার! আপনি আমার কে?

বললাম—কেউ না হলে বলা যায় না? থাক আব্বাসী, শুনতে, চাই নে। তুমি অন্য গল্প করো।

ও' তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—অন্য গল্প তো জানি না বাবুজী। আমি জানি আমার গল্প। বলতেও ভরসা পাই না, আবার না বলেও থাকতে পারছি না!

একটুক্ষণ থেমে, একটু দম নিয়ে আব্বাসী বলতে শুরু করলো,—দোস্তি বোধ হয় একেই বলে বাবুজী। নইলে, আমিই বা কে, আপনিই বা কে? ভিন্ দেশের লোক। তবু দেখুন, আপনিও না শুনে থাকতে পারছেন না, আমিও না ব'লে থাকতে পারছি না! আপনি কাল শাদীর কথা তুলেছিলেন, না বাবুজী? শাদী করবার বখ্‌ত্ কি কখনো মিলেছে? তবে হ্যাঁ, যখনকার কথা আপনি শুধোচ্ছেন, তখন শাদীরই মতন একটা-কিছু ঘটেছিল বটে জিন্দিগীতে।

আবার একটুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। নীরব হয়ে কী যেন ভাবতে লাগল একমনে। তারপরে এক সময় যেন চমক ভেঙেই জেগে উঠল আচ্ছন্নতা থেকে। তারপরে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলতে লাগল,—দীন মহম্মদ সাহেব তখনো বেঁচে। আমার সেই জঙ্গলের বস্তীতেই থাকেন আমার সঙ্গে। এক ঘরে উনি, অন্য ঘরখানায় আমি। দু'খানা ঘর ছিল আমাদের সেই কুঁড়ে ঘরে। না-না, ঠিক বললাম না। দু'খানা নয়, ঘর একখানাই, মাঝখানে বেড়া দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। সামনে দাওয়া। খানা পাকানোর ঘর ছিল আলাদা—উঠোনের উল্টো দিকে। সাহেবের তন্দুরস্তি তখন ভালো না,—খুক্‌খুক্ কাশেন, আর হর্‌রোজ রাতের বেলা বোখার হয়। মাইশোর থেকে এক হকিমের দাওয়াই আনা হয়েছিল, তাই খেয়ে কয়েকদিন একটু-আধটু চলে-ফিরে বেড়ান, তারপরেই আবার পড়েন। দেখাশোনা, খিদ্‌মদগারী আমিই করি। এক এক সময় বলি,—ওস্তাদজী, আপনি মাইশোরে চলে যান। এখানে পড়ে থেকে বেঘোরে জান্‌টা দেবেন কেন?

অল্প একটু হেসে বলতেন,—মাইশোরে কার কাছে যাবো? কে-ই বা আছে আমার? সারাটা জিন্দিগী হাতী আর কুম্‌কীদের নিয়ে কাটালাম, বিয়ে-শাদী করলাম না,—একটা বেটা-বেটীও নেই। তার থেকে এই-ই বেশ। অন্তেকাল যে এসে গেছে, তা' আমিও সম্‌ঝেছি। যে-ক'টা দিন আছি, তোর কাছেই থাকি বেটা। এখানে তুই আছিস, জুবেদা আছে, মরি তো তোদের সামনেই মরব।

এই দীন মহম্মদ সাহেবই একদিন বললেন,—দেখ্‌ বেটা, তুই শাদী কর এবার?

একটু অবাক হয়েই সাহেবের দিকে তাকিয়েছিলাম। বেদনার ছায়া পড়েছে সাহেবের মুখে। বললেন,—আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তোর শাদী করাই উচিত।

কোনক্রমে শুষ্ককণ্ঠে বলেছিলাম,—কেন, ওস্তাদজী?

—কেন?—ওস্তাদজী অবাক হলেন আমার থেকেও বেশী। বললেন,—ভবিষ্যৎ দেখছিস? আমার হাল দেখছিস? এখন এই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার সময় বুঝতে পারছি, শাদী না ক'রে কী ভুলই করেছি!

শুধু ঐ এক দিনই নয়, তারপরে অনেকবার কথাটা তুলেছিলেন তিনি। বলতেন,—আমার সওয়ালের কী জবাব হলো বেটা?

উত্তর দিতাম না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু কতক্ষণ? দেখা হ'লেই সেই এক কথা—শাদী কর। নইলে আমার মতন শেষ বয়সে পৌঁছে হায়-হায় করতে হবে।

একদিন উত্তর দিতেই হলো ওঁর পীড়াপীড়িতে। বলে উঠলাম,—শাদী যে করব, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

—দেবে না!—ওস্তাদজী বললেন,—তোর মতো নওজোয়ানের হাতে কেউ মেয়ে দেবে না! বল্‌ছিস কী?

বললাম,—ঘর আর সমাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি সেই বাচ্চা

বয়সে, আমাদের জাতের মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে কেন ?

আমায় সত্যিই ভালবাসতেন দীন মহম্মদ সাহেব। আমার কথা শুনে তাঁর উৎসাহ চেরাগ-নিভে-যাওয়ার মতোই দপ্ ক'রে নিভে গেল।

বললেন,—তাও তো বটে! তার ওপর আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছিস। আচ্ছা, তোর না একটা ভাই ছিল বলেছিলি? সে এখন কোথায় ?

বললাম,—আমার বাবা ত ছোটবেলাতেই চলে গেছেন। মা-ও শুনলাম কিছুদিন হলো মারা গেছে। থাকবার মধ্যে আছে ঐ একটিই ভাই,—আপ্পা। তা' সে থাকে শুনেছি মাইশোরে, বৃন্দাবন-বাগে মালী হয়ে।

বললেন,—তাকে লেখ্ না? যদি বিয়ের ক'নে একটি ঠিক ক'রে দিতে পারে।

হেসে উঠলাম। বললাম,—ক্ষেপেছেন আপনি! কোন্ মেয়ে আসবে এই জঙ্গলে, ঘর করতে? তা-ও হাতীর মাহুতের ঘর! দীনমহম্মদ সাহেব অগত্যা সেদিন চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাথায় আবার একটা বুদ্ধি এলো। বললেন, —দেখ্ বেটা, শাদী-টাদী বুঝি না, একটি ভালো মেয়ের খোঁজ করতে সব্বাইকে বলেছি। পাওয়া গেলে তাকে নিয়েই তুই থাকবি সেই হবে তোদের শাদী।

কথাটা শুনে সরম লেগেছিল, তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলাম বুড়োর কাছ থেকে, বাৎচিৎ না ক'রে। কিন্তু আমি পালালে উনিই বা ছাড়বেন কেন? আমার খোঁজ করতে করতে জুবেদার খোঁয়াড় পর্যন্ত এলেন। সান-বাঁধানো মেঝের ওপরে লোহার শক্ত আংটা পোঁতা থাকে, সেই আংটার সঙ্গে হাতীরা যে-যার খোঁয়াড়ে লোহার শেকলে বাঁধা থাকে। আমি যুবেদার পায়ের বেড়ি থেকে শেকল

খুলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালেন ওস্তাদজী। বললেন,—আমার সওয়ালের জবাব কী হলো, বেটা ?

বলে উঠলাম,—কিন্তু, অমন মেয়েই বা আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?

এবার চুপ করে যাবার পালা ওস্তাদজীর। আমার সওয়ালের জবাব এবার তিনিই দিতে পারলেন না। না পেরে তখনকার মতো সরে গেলেন বটে কাছ থেকে, কিন্তু একেবারে যে নিরাশ হয়েছেন, এমন মনে হলো না ভাবভঙ্গী দেখে।

একদিন—সকালের দিকেই হবে সময়টা। জুবেদাকে খাইয়ে-দাইয়ে তার খিদ্‌মদগারী শেষ ক'রে সবে ঘরে ফিরেছি—এমন সময় চম্‌কে তাকিয়ে দেখি—দীনমহম্মদ সাহেব কোথা থেকে যেন ঘরে ফিরে আসছেন, আর তাঁর পিছনে পিছনে আসছে একটি মেয়ে,—হাতে তার ছোট্ট একটি কাপড়ের পুঁট্‌লী !

হাঁ করে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে ওস্তাদজী বলে উঠলেন,—এই দেখ্ কী এনেছি !

পরনে ময়লা পাজামা, গা-টা খালি, গলায় কালো সুতো বাঁধা ধুকধুকি ঝুলছে একটা। এই অবস্থায় সেই যে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওস্তাদজী যতক্ষণ না কাছে এসে হাত ধ'রে সস্নেহে কথা বললেন, ততক্ষণে যেন কোনো সাড় ছিল না শরীরে। ওস্তাদজী বললেন,—ঘরে তোল্ একে।

আমাকে তখনো চুপচাপ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অল্প একটু হাসলেন দীন মহম্মদ সাহেব। তারপর নীচু গলায় বলে উঠলেন,—তোর কাছেই থাকবে। তোর বউ—তোর জরু।

চমকে উঠলাম। কী বললেন ওস্তাদজী ! ওঁর 'দিমাগ' ঠিক আছে ত ?

উনি বললেন,—ওর বাপকে অনেক টাকা ধ'রে দিয়ে তবেই ওকে এনেছি। খবরদার, হেলা-ফেলা করিস নে।

সাহেব যে তাঁর ঘরের মেঝেতে মাটি খুঁড়ে একটা হাঁড়িতে তাঁর অতিকষ্টে-জমানো টাকাগুলো লুকিয়ে রাখতেন, তা আমি জানতাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সমস্ত পুঁজি খুইয়ে তিনি যে এই কাজ করে বসবেন,—তা' ভাবতে পারি নি।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঢুকলাম ওঁর ঘরে। একটানে প্রথমে খাটিয়াটা সরিয়ে দিলাম। খাটিয়ার নীচে একটা সপ পাতা থাকত, সেটা উঠিয়ে দিলাম টান দিয়ে। তারপরে একটা খোন্তা নিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করলাম তাঁর সেই হাঁড়িটা।

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি. আমার অনুমানে ভুল হয়নি, হাঁড়ি-ভর্তি টাকা ছিল, এখন সেখানে পড়ে আছে মাত্র খান কয়েক টাকা।

মনে হলো—এখন না হয় উনি একটু ভালো আছেন, হেঁটে চলে একটু-আধটু বেড়াচ্ছেন,—কিন্তু আবার যখন সুট করে পড়বেন—তখন? —তখন শহর থেকে হকিমের দাওয়াই কিনে আনা হবে কী দিয়ে? হাতীশালা বাবদ খোরাকী পেয়ে ক'টা টাকা আর হাতে আসে বলুন? জঙ্গল বলে কথা, তাই কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়।

বলে উঠলাম,—এ-কী করেছেন, টাকা সব শেষ! সস্নেহে হেসে বললেন,—তা হোক। নে, এখন যা, তোর জরুকে ঘরে তোল্।

ঘর থেকে বাইরের দাওয়ায় এসে দেখি,—জরুই বটে! .

মাথা নীচু করে শান্তশিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে কী হয়, আসলে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

ভাবছিলাম,—শয়তানীর মনে শেষ পর্যন্ত এই ছিল।

আমাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে, চোখ তুলে একবার তাকালো। নীচের পুরু ঠোঁটের উপর দিয়ে যেন একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল। চোখ ছোট নয়, কিন্তু একটু কোটরে ঢুকে যাওয়া। তাতে ক'রে চোখের দৃষ্টি হয়েছে ধারালো। কারুর দিকে স্থির

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে, চোখের আগুন দিয়ে সবাইকে ও বুঝি পুড়িয়েই মারতে চায়।

ও-মুখ নতুন দেখছি না; নতুন দেখছি না ও-চোখের ভ্রূ-ভঙ্গী। এবং দেখছি না বলেই তাজ্জব ব'নে গিয়ে এই কথাই ভাবছি,—ঘরের ভিতরে ওস্তাদজীর পিছনে পিছনে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালো কিনা আমারই……

ওকে আমি অনেকবার দেখেছি। আর, দেখেছি বলেই মনে মনে ওর নামও দিয়েছি—'শয়তানী'। এ-নাম দেওয়ার ভিতরের কথাটা আমি ছাড়া আর জানবে কে? দীন মহম্মদ সাহেবের মতো ভাল মানুষ—যিনি ঘরে থাকলে নিজের মনে বসে 'কোরান সরীফ' পড়েন, আর বাইরে বেরুলে হাতীশালায় হাতীগুলোর ঠিকমতো খবরদারী হচ্ছে কিনা দেখে বেড়ান, তিনি তামাম্ দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে-না-হচ্ছে, সেসব খবর রাখেনও না, খবর রাখবার মতো মনও তাঁর নেই। থাকলে, অনেককিছুই তাঁর চোখে পড়তো; অন্ততঃ শয়তানীর ছলাকলা তাঁর মতো মানুষের চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

বুঝলাম, তিনি জওয়ানীর শরীর আর ঢলঢলে মুখখানা দেখেই গ'লে গেছেন। গ'লে গিয়ে, তাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রিয় সাকরেদ এই আব্বাসীর জন্য। আমারও তখন জওয়ান বয়স, তার ওপরে সে সময়টা ছিল বনে-বনে মিষ্টি হাওয়া লেগে হল্‌দে আর গেরুয়া রঙের পাতাগুলোর টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে যাবার কাল। কচি কচি সবুজ আর নতুন পাতায় সারা বন ছেয়ে যাবার পালা এসেছে তখন, ওর দিকে তাকিয়ে এমনিতেই চোখদু'টি আবেশে জড়িয়ে আসতে চায়! বুঝলেন বাবুজী, তখন হচ্ছে কান পেতে জওয়ান বয়সের জয়গান শোনবার দিন। কিন্তু সে গান শোনবার বা বোঝবার মতো মন চাই, সে মন কি আমার জেগেছিল? আর

সব মাহুত ছোক্‌রারা যা করত, আমিও তাই করতাম—হাতী নিয়েই সারাদিন কাটতো বলা যায়। সময় আর সুযোগ পেলে ওরা গায়ে কামিজ চড়িয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে শহরের দিকে পা বাড়ায়—জমানো পয়সা তখন ওদের পকেটে ঝন্‌ঝন্‌ করতে থাকে। বিয়ে-শাদীর কথা চিন্তাও করেনা,—মাঝে মাঝে শহরে যেতে পারলেই ওরা খুসী। ঠিক এই ব্যাপারটায় ওদের সঙ্গে আমার মিল হ'তো না; আমি কখনো ও-ভাবে ফুর্তির খোঁজে শহরে রওনা হ'তাম না। বরং ওরা কেউ না থাকলে, বা মনটা উদাস-উদাস ঠেকলে রফিক চাচার কাছে চলে যেতাম। রফিক চাচার শরীরে ভাঙন না ধরলেও দাড়ীতে পাক ধ'রেছে, মাথার লম্বা লম্বা চুলও প্রায় সবই সাদা হ'য়ে গেছে। একাই থাকে সে তার ঘরে। ঘুড়ী বানানোর থেকেও মস্ত একটা গুণ ছিল চাচার,—গুন্‌ গুন্‌ ক'রে সুন্দর গজল গাইতো। ঐ রফিক-চাচার কাছ থেকেই শোনা গজলের এক-আধটা লাইন আমার তখন মনের মধ্যে গেঁথে যেতো। অদৃশ্য কাকে যে উদ্দেশ ক'রে আমার মন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যেতো, তা' আমি জানতাম না বাবুজী। বোধ হয় বয়সের ধরমই এই। চাচার গজলের লাইন বারবার মনে মনে আউড়ে যেতে ইচ্ছা করত,—"তমন্নাওকোঁ জিন্দা আরজুওকোঁ জোঁয়া করলু,—এ শর্মিলি নজর কহে দেতো কুছ গুস্তাকিয়া করলু।' যার মানে হচ্ছে বাবুজী,—আমার মনের ভিতরে যে আশা আর আকাঙ্ক্ষা আছে, তাকে বাঁচিয়ে তুলে একটুখানি অন্যায় করে বসি, যদি তোমার সরম-লাগা দু'টি চোখ আমাকে অনুমতি দেয়।

তা'হলেই বুঝুন বাবুজী, আমার তখন সর্বনাশ হবারই বয়স চলেছে ওকে দেখে তবুও আমার একবার মনে হলো, ওকে ওর বাপের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে টাকাগুলো কি ফিরিয়ে আনা যায় না? অতোগুলো টাকা! যাকে বলে 'পশিনা আর খুন'-এর

বদ্‌লা টাকা,—সেইটাকা দিয়ে আনা হলো কিনা শেষ পর্যন্ত ঐ শয়তানীটাকে !

কিন্তু, কাকে ব'লবো এ-কথা, কাকে বোঝাবো? দীন মহম্মদ সাহেব কোনো কথাই কানে তুললেন না। উল্‌টে বললেন, টাকা দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনব? জবান্ দিয়ে জবান্ ফিরিয়ে নেবো? ইন্‌সানের ধরমের কাছে গুস্তাকী হবে, খোদাতালার কাছে গুস্তাকী হবে।

ওঁর কাছ থেকে সরে আসবার পর আরও একটা কথা মনে হ'লো। মনে হ'লো, শয়তানীর বুড়ো বাপটাই বা টাকা ফেরত দিতে চাইবে কেন? তাছাড়া, সে'টাকা কি আর আছে? এতক্ষণে সে'টাকা হয়তো মদটদ্ খেয়ে নয়-ছয় করে ফেলেছে বুড়ো।

আসলে বুড়োটার শয়তানীও কি কম? জাতে জংলী, কিন্তু জংলীদের কোনো গাঁয়ে ওরা থাকে না। কী এক ব্যাপারে ওদের বার করে দিয়েছে ওদের সমাজ থেকে। বোধ হয় আগেই বলেছি বাবুজী, আমাদের ঘরের কিছুটা দূরেই ছিল একটা ডাকবাংলো। বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে ডাকবাংলো। আমাদের ঘর থেকেও দেখা যায়। সেই ডাকবাংলোয় শিকারীরা এসে উঠতো, সাহেবরা এসে উঠতো, রাজা-বাহাদুরের দারোগারা এসে উঠতো। এই যে ডাক-বাংলো, এরই কিনারায় ছিল বাংলোর দেখ্‌ভাল যে করবে তার ঘর; বাংলোর ঝাড়ুদারের ঘর। ঝাড়ুদারকে আমরা খুবই চিনতাম। মিশকালো কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলওয়ালা চেহারা, খুবই বেঁটে, বামনও বলা যায়; তার ওপরে, এক পায়ে বেশ খানিকটা খুঁড়িয়ে চলে। কে যে কবে ওকে কোত্থেকে নিয়ে এসেছিল জানি না। ও জংলীদের জাত নয়, ওর নাম—আপ্পানা। এমন কি ক্যানারীজ ভাষীও সে নয়; কথা বলে তেলেগুতে। হিন্দীও বলে। দু-একটা আংরেজী জবান্ পর্যন্ত বলতে পারে। বলে,—সাহেবলোকদের খিদ্‌মদগারী ক'রতে ক'রতে আংরেজী জবান্ মালুম হয়ে গেছে।

আপ্পানা এমনিতে ভালো লোক, কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কখনো খালি গায়ে, কখনো বা সাহেবদের দেওয়া তালি-মারা হাফ্ প্যান্ট্ প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড্ড নেশার ঝোঁক ছিল আপ্পানার, এক-একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। তখন হৈ-হল্লা ক'রত, যাকে যা মন চায় তা-ই বলে বসতো। এর জন্য কম চড়-চাপড়টা ও খেয়েছে? মাঝ রাতে বাংলো থেকে হল্লা ভেসে আসতো এক-একদিন। তখনই আমরা কান খাড়া ক'রতাম। বুঝতাম, এইবার ও সাহেবদের কাছ থেকে চড়-চাপড় খাবে, আর তারপরে হাউ-হাউ ক'রে কান্না জুড়ে দেবে। এক-একদিন রাগ ক'রে ব'লতাম,—সরম লাগে না তোর, দিনরাত শরাবে ডুবে আছিস?

আপ্পানা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতো কিছুক্ষণ, তারপরে বলতো,—আমার মতো ময়লা সাফ করার কাজ ক'রতে হ'লে বুঝতিস, কেন মদ খাই। না খেলে ইন্সান্ ও 'গন্ধি কাম' কখনো করতে পারে? মাঝে মাঝে একটু বেশী হয়ে যায়, তা' কী ক'রব বল্? সাহেব লোকেরাই এক-একসময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না, আমিতো কোন্ ছার।

যাই হোক, আপ্পানা ছিল ঝাড়ুদার, আর শয়তানীর বাপ ঐ জংলী বুড়োটা ছিল বাংলোর দরওয়ান বা খিদমদগার। দরকার হ'লে সাহেবদের রান্না পর্যন্ত করে দেয়। কী করে কখন কতদিনে ও-যে সাহেবদের রান্নাবান্না শিখে ফেললো তা আমরা জানি না। শুনেছি, সাহেবদের মন যুগিয়ে চলতে ওস্তাদ লোক। আপ্পানার মতো ওরও নেশার ঝোঁক আছে, কিন্তু কখনো হল্লা করেনা, নেশা বেশী হলে কেমন যেন ঝিম্ মেরে চুপচাপ বসে থাকে। আমাদের ভাষায় বুড়ো বলেই আমরা ডাকি, বাংলোয় সাহেবরা একে কেউ ডাকে দরওয়ান, কেউ ডাকে বাবুর্চী, কেউ ডাকে বয়। ছোট-ছোট গোল গোল চোখ, সবসময়ই যেন পয়সার লোভে চিক্‌চিক্ করছে। বাংলোর

কিনারায় তার জন্য নির্দিষ্ট যে ঘরখানা, সেটাতেই সে থাকতো; সঙ্গে তার এই শয়তানী মেয়ে।

সবই তো আমরা দেখতাম! মেয়ে জওয়ানী হয়েছে কী না-হয়েছে, বুড়ো বাপ অম্‌নি তাকে পাঠাতে শুরু ক'রলো বাংলোর সাহেবদের কাছে।

—এই, অমুক উঠেছেন, নাস্তা দিয়ে আয়।

—অমুক উঠেছেন, গোসলখানায় জল তুলে দিতে বল।

জল তুলবার কাজ আপ্পানা ক'রত না। তখন আমাদেরই কাউকে ডেকে পাঠানো হতো। আমাদের মধ্যে যে-যখন সময় পেতো, উপুরি রোজগারের আশায় জল তুলে দিয়ে আসতো ক্যানেস্তারা ভর্তি ক'রে। দু-একবার আমিও যে ও-কাজ না করেছি এমন নয়। কিন্তু পরে এ-ও দেখেছি, বুড়ো নিজেই বাড়তি পয়সার লোভে জল তুলে দিয়েছে। মেয়ে বড়ো হলে, মেয়েকে দিয়ে পর্যন্ত জল তুলিয়েছে।

আপনাকে বলব কী বাবুজী, দেখতে-দেখতে মেয়েও শয়তানী হয়ে উঠলো। শরমের কথা বাবুজী, তবু বলি—শয়তানী মেয়েও 'কুম্‌কী'দের মতো রং-ঢং দেখিয়ে সাহেবদের লালচ্‌ বাড়িয়ে দিতো। আমি সবই জানতাম, সবই দেখতাম,—তাই ওর দিকে কোনোদিন ফিরেও তাকাতাম না। কিন্তু, তাজ্জব ব্যাপার বাবুজী, ও কিন্তু আমার সঙ্গে ভাব ক'রবার জন্য বহুত কোশিস করেছে।

—আব্বাসী, জল তুলে দিয়ে যা-তো?

ঠিক যেন কোথাকার বেগম-সাহেবা, এম্‌নিভাবে হুকুম ক'রছে। পাছে ওর হুকুম কানে আসে, তাই বাংলোর সামনে দিয়ে চলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবু কি নিস্তার আছে?

—এই আব্বাসী, কাঠ ফেঁড়ে দিয়ে যা-না?

বলতাম,—আমার সময় নেই।

বলতো,—তাহলে আমি কী ক'রব? উনুন ধরাবো না? অফ্‌সর লোগ এসেছে, সময় মতো খাবার না পেলে গোঁসা ক'রবে।

—তোর বাবা কোথায়?

—বাবা বাজারে গেছে।

রাগ করে ব'লতাম,—তুইও বাজারে যা।

তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠতো। বলতো,—তাতে খুব মজা লোটবার সুবিধা হয় তোমার, না?

ওকে আঘাত করতে পেরেছি বুঝে মনটা আমার ঠাণ্ডা হ'তো খানিকটা! উঠে ব'লতাম,—চল, কতো কাঠ আছে দেখি, ফেঁড়ে দিয়ে আসি।

—ভাগ্! কিচ্ছু করতে হবে না তোকে।

ব'লে, দুমদাম পা ফেলে ফিরে গেছে বাংলোয়।

কিছুক্ষণ পরে, পা টিপে টিপে ওদের বেড়ার কাছ পর্যন্ত গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি,—নিজেই কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

বলব কী বাবুজী, এই মেয়েরই এক-একদিন আবার অন্য রকম ব্যবহার! ছোট্ট ঢিল ছুঁড়ে আল্‌তো ক'রে আমার গায়ে তাক্ ক'রে মেরেছে। কিম্বা কুঁয়োর জল তুলতে তুলতে আমাকে দেখে হঠাৎ দড়ি-সুদ্ধ বাল্‌তি হড়্‌হড়্ ক'রে কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠেছে,—ঐ যাঃ! বাল্‌তি গেল, বাল্‌তি গেল!

ছুটে গেছি তাড়াতাড়ি। কিন্তু কাছে যাওয়ামাত্র খিলখিল করে হেসে ছুটে পালিয়েছে। চেঁচিয়ে বলতাম,—ঢং ক'রে বাল্‌তি ফেল্‌লি যে? এবার এসে কাঁটা দিয়ে নিজে তোল্। আমি চললুম, ব'য়ে গেছে আমার বাল্‌তি তুলতে।

তখন বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। হাতে লোহার কাঁটা (যা দিয়ে কুঁয়োয়-পড়ে-যাওয়া বালতি তোলে) আর দড়াদড়ি।

মুখখানা তখন চুপ্‌সে-যাওয়া। বলেছে—বাপু বকবে। তুলে দে-না।

—কেন, ফেলে দেবার বেলা মনে ছিল না?

ব'লতো,—বা-রে, ইচ্ছে ক'রে ফেলেছি নাকি!

—ইচ্ছে করে নয়?—ধমক দিয়ে ব'লে উঠতাম,—আবার ন্যাকামী হচ্ছে! আমি দেখিনি দু'চোখ দিয়ে? আমাকে ভোলাবি? কাঁদোকাঁদো হয়ে উঠতো মুখখানা। ব'লতো,—আমি কি মিছে বল্‌ছি?

—না, খুব সত্যি বল্‌ছ!—আমি ব'লে উঠতাম,—রইল তোর বাল্‌তি, অন্য কাউকে ধ'রে তোলাবার চেষ্টা কর, নইলে নিজে তোল, আমার দ্বারা হবে না। আমি চললুম।

—ঈ-স, ভয় দেখাচ্ছে!—ব'লে, ঠোঁট উল্‌টে একটা ভঙ্গী ক'রে শেষপর্যন্ত নিজেই কুঁয়োতে কাঁটা ফেলবার আয়োজন ক'রতো। আপনি ভাবছেন বাবুজী, ও আর রাগ করে আমার সঙ্গে বুঝি কথাই বলতো না!—খুব বলতো, বলবার জন্য উসখুশ ক'রত। জানেন তো, এ-দেশে 'পঙ্গল' সব থেকে বড়ো উৎসবের দিন? পৌষ মাস যেদিন শেষ হয়, সেই দিনটা এ-দেশে খুব বড়ো উৎসব। শয়তানী পঙ্গলের দিন থালায় ক'রে কলা, নারকেল আর নাড়ু নিয়ে এসেছে আমাদের ঘরে। বেছে-বেছে এমন সময়, যখন দীন মহম্মদ সাহেব ঘরে নেই, আমি একাই আছি।

ওর সাড়া পেয়ে ঘর থেকে দাওয়ায় আসতাম। ভালো মানুষটির মতো মুখ করে থালাটা নামিয়ে রাখতো দাওয়ায়।

বল'তাম,—এসব আবার কী, ফি বছর?

ও ব'লতো,—আমি কী ক'রব, বাপু পাঠিয়ে দিয়েছে।

একবার ব'লে ফেলেছিলাম,—যদি না নেই? যদি ফেরত দেই?

মুখ তুলে তাকিয়েছিল, তারপরে বলেছিল,—থালাটা শীগ্‌গির

মে। তোর সঙ্গে দিল্‌লাগি করতে আসিনি। আমার অনেক কাজ আছে।

বাবুজী, বাংলোয় থাকতে থাকতে আর সাহেবদের সঙ্গে মিশতে মিশতে 'হিন্দী'জবান্‌ পর্যন্ত ওর মালুম হয়ে গেছে। আর বলব কী, ঘাঘ্‌রার ওপর ঘুরিয়ে কায়দা ক'রে শাড়ী পর্যন্ত প'রতে শিখে গেছে!

এই তো সব-পিছনকার ঘটনা, যা দীন মহম্মদ সাহেব জানেন না, জানি আমি। ওকে দেখে সব যেন এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল। কিন্তু কী-ই বা করা যাবে? ওস্তাদজী নিজে ওকে সঙ্গে করে এনেছেন; তিনি যখন ওকে ফিরিয়ে দিতে রাজী নন, তখন ওঁর হুকুমটা মেনে নেওয়াই ভালো। নইলে, এ-মেয়ের ওপরে আমার 'নফ্‌রৎ' আছে, পেয়ার নেই।

একটু রুক্ষ স্বরেই ব'ললাম,—এ-ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, —না, ভিতরে আসবে?

ঠোঁট টিপে অল্প একটু হাসল, কিন্তু কিছু ব'লল না। পুটুলী হাতে পায়ে পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলো, যেন ওর কতো চেনা আমার ঘরখানা।

ব'ললাম,—রাখো তোমার পুঁট্‌লীটা ঐ আমার বাক্সের ওপর।

'তুমি' করে ওকে কস্মিনকালেও বলি না; কিন্তু সেদিন মুখ দিয়ে আমার 'তুমি'ই বেরিয়ে গেল, জানি না কেন। ও-ও যে সেটা লক্ষ্য ক'রছে, সে-ও বুঝলাম ওর ঠোঁটের চাপা হাসিটুকু দেখে।

—কী হলো, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ঘরের কোণায় আমার একমাত্র সম্পত্তি—রঙ্‌চটা একটা বড়ো টিনের বাক্স ছিল,—পুঁট্‌লীটা নিয়ে গিয়ে রাখল তার ওপরে। ব'ললাম,—খাটিয়ার ওপরে বোসো।

বসলো। বললাম,—হঠাৎ এ-মতি হলো যে?

চোখ তুলে তাকালো, আবার পরক্ষণেই নামিয়ে ফেললো। ঠোঁটের কোণে তখনো হাসির রোশনাই নিভে যায়নি।

বললাম,—নিজের মর্জি,—না, বাপের?

ছোট্ট উত্তর,—নিজের।

—টাকার বদলে?

তেমনি ছোট্ট উত্তর,—টাকা বাপের, মর্জি নিজের।

ব'ললাম—ক'দিন থাকবে এ-মর্জি?

ঠোঁট টিপে আবার একটু হাস্‌লো, ব'ললো,—অন্তেকাল পর্যন্ত।

ব'লে উঠলাম—কথা খুব শিখেছ দেখছি।

বললে,—শিখলুম আর কই? যখন-তখন গজলের সুরে 'বয়েৎ' আওড়াতেই পারি না!

বুঝলাম, শয়তানী এ-খোঁজটাও রাখে। রফিক-চাচার ওখানে গিয়ে যে বয়েৎ শিখে আসি, সেটা পর্যন্ত শয়তানীর নজর এড়ায়নি। ব'ললাম,—গজলের সুরে বয়েৎ আবার কে আওড়ায় এ-জঙ্গলে, এক রফিক-চাচা ছাড়া?

ও বললে—আওড়ায় আরও একজন। সে রফিক চাচার মতো বুড়ো নয়, নওজোয়ান।

—তাই নাকি!

ও বললে—তার ধারণা, তার জুবেদাই শুধু তার বয়েৎ শোনে, আর কেউ শোনে না।

মনে মনে চম্‌কে উঠলাম। বনের আড়ালে আমি যখন জুবেদাকে নিয়ে গিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখি, ঘুড়ি ওড়াই, আর চীৎকার করে নতুন শেখা উর্দু বয়েৎ আওড়াই, ও কি লুকিয়ে লুকিয়ে সে পর্যন্ত গিয়ে সে-সব শুনে আসে নাকি?

ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আশ্চর্য নয়, এ-শয়তানী সব পারে। ভয়ডর ব'লে এর বুঝি কিছু নেই। শুনে শুনে দু'-একটা বয়েৎ শিখে নিয়েছে কিনা, তা-ও বা কে জানে!

ব'লে উঠলাম,—জুবেদা ছাড়া আর যে শুনেছে, সে কি মনে রাখতে পেরেছে কিছু?

চোখদুটো চিক্‌চিক্ করে উঠলো খুশীর আভায়। ব'ললে,—একেবারে হার মানবে সে, এ-কি হতে পারে?

কৌতুক বোধ করে বলে উঠলাম—শুনি?

খেয়াল মতো কখন কোন্‌টা আওড়াই, নিজেরই ঠিক নেই। কখন যে কোন্‌টা মনে পড়ে যায় তা নিজেই ব'লতে পারবো না। তার থেকে এ-আবার শিখে নিলো কোন্‌গুলো?

ও ব'ললে—একটা লাইন শুধু মনে আছে।

—শুনি?

ও বললে—'ও আগর আ না সকে, মোত্‌হি আই হোতি।'

ব'ললাম—মানে জানো?

বললে—হ্যাঁ।

—কী ক'রে জানলে?

ব'ললে—বাংলোয় এক সাহেব এসেছিল, সে জানিয়ে দিয়েছে। আমি যখন-তখন ওটা আওড়াতাম যে! সে ব'ললে—কথাটার মানে জানো? বললাম—না। তখন সে শিখিয়ে দিলে।

—কী বল তো শুনি, মানেটা?

ও ব'ললে,—ও যদি না-ই এলো, তো, মরণই আসুক,—সে-ও ভালো।

এ-ও এক আজব ব্যাপার বাবুজী, ও যে বয়েৎ শোনে লুকিয়ে লুকিয়ে, বয়েৎ আওড়ায়, তার মানে পর্যন্ত জেনে নেয়,—এ আমি কী করে জানবো?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ওর পাশে বসে পড়লাম খাটিয়ার ওপরে। ব'ললাম,—আমার ঘরে থাকতে এসেছ যখন, মাথা ঠিক করে থাকতে হবে, বুঝেছ? অন্য কোথাও যেতে পারবে না, কেমন?

মাথা হেলিয়ে জানালো,—আচ্ছা।

ব'ললাম,—বাংলোয় এখন কোনো সাহেব নেই?

মাথা নেড়ে জানালো,—না।

বললাম,—সাহেবরা এলে তখন কিন্তু একদম যেতে দেবো না। রাজী ত?

এবারেও মাথা হেলিয়ে উত্তর দিলো,—হ্যাঁ।

নিশ্চিন্ত বোধ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। ব'ললাম,—ব্যস, ঠিক আছে। থাক্ তুই আমার কাছে।

'তুমি' থেকে হঠাৎ আমার এই 'তুই' তে ফিরে আসা,—মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সে বুঝতে চেষ্টা ক'রল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আরও একটু যেন সহজ হ'য়ে উঠল এবার ও আমার কাছে।

উঠে দাঁড়ালো। কাছে এলো। ব'ললে—কী ক'রব এবার আমি?

—কী ক'রব মানে!—একটু অবাক হয়েই ব'ললাম,—নবাবের হারেমে এসেছিস নাকি? যা-দেখে আয় রান্নাঘরের ব্যবস্থা।

ব'ললে—রান্না চাপাতে হবে বুঝি?

—হবে বই কী! নইলে খাবো কী? সাহেবই বা কী খাবেন?

আর কথা না ব'লে লঘুপায়ে চ'লে গেল রান্নাঘরের দিকে। আমি উল্‌টো দিক থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে সাহেবের ঘরে গেলাম। দীন মহম্মদ সাহেব তাঁর চাটাই, তাঁর খাটিয়া,—সব যেমন ছিল তেমনি ভাবে সাজিয়ে রেখে কখন যে বেরিয়ে গেছেন, আমরা

টেরও পাইনি। ওঁর ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে নিজের ঘরে এসেছি, ও এসে দাঁড়ালো সামনে। ছুটোছুটিতে একটু যেন হাঁপাচ্ছে। ব'ললে,—কী রান্না হবে? জোয়ারী রুটি আর রাঙা আলুর তরকারি?

—আর তেঁতুলের টক্।

ব'ললে—ব্যস!

—ব্যস। গরীবের ঘরে আবার কী হবে?

কথাটা শুনে ধীর পায়ে ও চলেই যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডেকে উঠলাম,—শোন্?

ফিরে দাঁড়ালো।

ব'ললাম—কাছে আয়।

এলো। বললাম—আঁচলটা দেখি?

বাম বুকের কাছে একটা হাত চেপে রেখে অন্য হাতটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে শাড়ীর আঁচলটা ঘুরিয়ে সামনে আনলো। আমি আঁচলটা খপ ক'রে ধরে বেঁধে দিলাম আমার চাবির রিং। ব'ললাম —ঘর দুটোর চাবি, বাক্সের চাবি,—সব এতে রইল।

খুসীর আভায় মুখখানা ঝলমল করে উঠল। ছেলেমানুষের মতো সারা শরীরে খুসীর একটা ঢেউ তুলে ব'লে উঠলো,—সব আমায় দিয়ে দিলি!

—হ্যাঁ।

ব'ললে—যদি চুরি করি?

—কী চুরি করবি? টাকা-পয়সা নেই। সব তোর বাপের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন ওস্তাদজী।

ব'ললে—অন্য কিছু যদি চুরি করি?

—কী? কাপড়-টাপড়? আয়না-চিরুনি?—বলে উঠলাম, —চুরি করে পালাবি কোথায়? ঠিক ধ'রে নিয়ে আসবো।

ও বললে,—ঈস ! ধরা না দিলে আর ধ'রতে হয় না !

ব'ললাম—খুব যে দেমাক দেখছি।

ও বললে—হবে না কেন ! আমাকে এক সাহেব 'বনের রাণী' বলেছিল, তা' জানিস ?

বেশ অনুভব ক'রলাম, কথাটা শুনে আমার চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে গেল ! দাঁতে দাঁত চেপে ব'লে উঠলাম,—রাণীগিরি তোমার আমি ঘোচাব। কার কাছে এসেছ, তুমি তা' জানো না ?

ও চোখ বড়ো বড়ো ক'রে তাকালো। কথাটায় ও যে বিন্দুমাত্রও ভয় পেয়েছে এমন মনে হ'লো না। একটুক্ষণ থেমে হঠাৎ মুখ টিপে আবারও একটু হাসলো, তারপর ব'ললো,—মারবি তো ? বেশ তো মারিস ! পুরুষের মার সওয়াও আমার অভ্যেস আছে।

ব'লে, আর দাঁড়ালো না,—তাড়াতাড়ি স'রে গেল রান্নাঘরের দিকে। আমার মনটাও তখন চাইছিল ওর পিছনে-পিছনে যেতে; গিয়ে ওর কাছে বসে গল্প ক'রতে। কিন্তু না, জোর ক'রে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম অন্যদিকে। যেখানে আমাদের হাতীগুলো থাকে, যেখানে খিদ্‌মদ্‌ গারেরা সবাই মিলে এখন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সেখানে আমার যাওয়ার দরকার; না গেলে খারাপ দেখাবে।

কিন্তু বাবুজী, আপনাকে এইখানে একটা কথা ব'লে রাখি। আমারও তখন জোয়ান বয়েস, সত্যি কথা বলতে কী, এর আগে কখনো 'আওরৎ'-এর সঙ্গে মিশি নি। জংলী মেয়েদের দেখেছি আশেপাশের গাঁয়ে; আশেপাশে কেন, কাছাকাছি থেকেই দেখেছি তাদের। দীনমহম্মদ সাহেব, আমি আর রফিক চাচা ছাড়া, আর যারা হাতীদের খিদ্‌মদ্‌গারী করে, তারা সবাই জংলী। এই জংলী মেয়েরা তাদের মরদদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে বই কী !

কিন্তু, কখনো তাদের কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা আমি করিনি বাবুজী। করিনি বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই জংলী মেয়েরই দোস্তি লেখা ছিল আমার নসীবে।

এই ধরনের সাতপাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কাজে চ'লেছিলাম। জুবেদা অনেকক্ষণ আমাকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। গাঁয়ের একপ্রান্তে, জংলীদের ঝুপ্‌ড়িগুলোর কাছাকাছি বড়ো বড়ো লম্বা-লম্বা শক্ত খুঁটির ওপরে চালা তুলে হাতীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের এখানে হাতী আছে আপাততঃ গোটা চারেক ; তারমধ্যে তিনটিই কুম্‌কী হাতী, একটা দাঁতাল। আর-আর হাতীগুলো আছে অন্য সব জংলী গাঁয়ে। দীন মহম্মদ সাহেব গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে সব হাতীদেরই দেখে বেড়ান। হাতীর ব্যাপারে এত-কিছু উনি জানেন যে, হাতীদের মামুলী অসুখ-বিসুখে উনি নিজেই দাওয়াই বাত্‌লে দেন। 'খেদা'র হুকুম যখন আসে, তখন সব গাঁ থেকেই বেছে বেছে হাতী নিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করার ব্যবস্থা করেন। তখন শহর থেকে আরও সব লোকজন আসে ; সব-কিছু যে ওঁরই ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, এমন নয়। তবে, দীন মহম্মদ সাহেবকেই জংলীরা সর্দার ব'লে মানে, ওঁকে ওরা ভালও বাসে,। ও'দের ভাষা উনি এত চমৎকার ব'লতে পারেন যে, বাইরের লোকে ওঁকে মনে করে—উনি বুঝি ঐ জংলীদেরই একজন। তবে, একটা জিনিস আছে সেটা আমাদের থেকে ভালো পারলেও জংলীদের মতো এখনো উনি পারেন না। হাতী-চালনার ব্যাপারে এখনো ওঁ'র 'খেঁটে' দরকার হয়। হাতী তাড়ানোর খেঁটে কখনো দেখেছেন বাবুজী—হাতীর গায়ে খোঁচা দিয়ে তাড়না করবার জন্য সূক্ষ্ম অস্ত্র? ছোট্ট বেঁটে লাঠির মতোই দেখতে জিনিসটা, কিন্তু মাথায় থাকে এক টুক্‌রো লোহার ফলা। তাজ্জবের কথা বাবুজী, জংলীরা 'খেঁটে' ব্যবহার করে না! ওরা গলা দিয়ে এমন একটা স্বর বার করে যে,

সেই স্বর হাতী বুঝতে পারে, আর সেই 'স্বর' যা হুকুম দেয়, সেই মতো চলতে থাকে। হাতী পাগ্‌লা হয়ে যায় মাঝে মাঝে, জানেন তো বাবুজী? একদম 'বাউরা' হয়ে যাবার কথা বলছি না; একদম 'বাউরা' হ'লে হাতী হয়ে যায় গুণ্ডা। সে অন্য ব্যাপার। তখন দরকার হ'লে শহর থেকে শিকারী আনিয়ে বন্দুক দিয়ে গুলী ক'রে মেরে ফেলতে হয় পর্যন্ত। না বাবুজী, আমি গুণ্ডা হাতীর কথা বলছি না। এক-একটা সময় হাতীর কান থেকে কী এক রকম গন্ধ বেরোয়, সেই গন্ধ পেলেই হুঁসিয়ার হয়ে যেতে হবে, হাতীকে বেঁধে ফেলতে হবে। ঐ সময় ভালো পোষা হাতিরও আক্কেল থাকে না, জ্ঞানগম্যি থাকে না।

ব'লতে-ব'লতে এই সময় আবার থেমে গেল আব্বাসী। থেমে, কী যেন ভাবতে লাগলো নিজের মনে। ওর কাহিনীর মধ্যে আমিও ডুবে গেছি; নইলে, অদূরে আপ্পা ঐ যে কী-একটা কাজে ব্যস্ত, একবার বাইরে যাচ্ছে আবার আসছে,—সে সব ব্যাপার ছায়াছবির ঘটনা বলে মনে হবে কেন? অলস চোখে যেন আপ্পাকে নয়, আপ্পার 'ছায়া' দেখে চলেছি। একটা ছায়া যেন ঘরের দাওয়ায় আসছে, বাহিরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে।

আব্বাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরম্ভ ক'রল,—কথা ব'লতে-ব'লতে আবার যেন সব চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ছে বাবুজী!—চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হাতীঘরের কাছে সেদিন লোক জড়ো হয়েছে অনেক। একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, আর মাঝে মাঝে সরু গলায় হাতীর চীৎকার! বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়—জুবেদার কী অসুখ ক'রলো?

একরকম ছুট্‌তে-ছুট্‌তেই কাছে গেলাম। প্রথমেই খোঁজ ক'রলাম জুবেদার। জুবেদা যেমন তার জায়গাটিতে বাঁধা থাকে, তেমনি বাঁধা আছে—শুঁড় দুলিয়ে-দুলিয়ে খেলা ক'রছে। আমাকে দেখতে

পেয়ে শুঁড়টা আরও ঘন ঘন, আরও জোরে জোরে দোলাতে লাগলো। আদর ক'রে ব'ললাম,—কী রে, এত আহ্লাদ কিসের? নাস্তা হয়েছে?

ছোট-ছোট চোখদুটো ওর শিশুর খুসী-হওয়া চোখের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর সঙ্গে আদরের ভঙ্গিতে বিড়বিড় ক'রে কথা বলা আমার অভ্যাস,—আর, আমার তখনকার সেই সব আবোল-তাবোল 'যা-মনে-আসে-তাই' কথাগুলো যদি আপনি শুনতেন বাবুজী, তা'হলে আপনার মনে হতো,—লোকটি নিশ্চয়ই বাউরা হয়ে গেছে।

বলে উঠলাম,—কী ধরনের কথা তুমি ব'লতে আব্বাসী? একটু শুনি না।

অল্প একটু হেসে উঠলো আব্বাসী। বললে,—মনে ক'রতে গেলে আমারই হাসি পায়। ওকে ব'লতাম, তোকে নিয়ে শহরে যাবো, শহরে বড়ো-বড়ো দেকোন, দোকানে সব নানান রকমের মেঠাই সাজিয়ে রেখেছে। তুই শুঁড় দিয়ে টপাটপ তুলে আনবি, আর দু'জনে মিলে খাবো! কী-বলিস?

ব'ললাম,—এই কথা! এই জন্যে এত লজ্জা পাচ্ছিলে!

—না বাবুজী,—আব্বাসী বললে,—জঙ্গলে থাকি, গরীব মানুষ, খাবার-দাবার, মেঠাই-মণ্ডা কোথায় পাবো? লেকিন, মনে মনে লোভ তো হতো খাওয়ার। তাই খোয়াব দেখতাম, যেন শহরের রাস্তায় গিয়ে ভালো ভালো মেঠাই-মণ্ডা লুটপাট্ ক'রে খাচ্ছি। শায়দ, এ-সব তো মামুলী চিন্তা। এ-সব ছাড়া আর যা' ব'লতাম, সেগুলো শুনলে আপনি হাসবেন বাবুজী। জুবেদার কানে কানে বাউরার মতো ব'লতাম,—জুবেদা, শহরে তো যাবো তোকে নিয়ে? রাস্তায়—ধর্ খাপসুরৎ এক জওয়ানী বেরিয়েছে একা একা হাওয়া খেতে। ব্যস! আর যায় কোথায়? তুই শুঁড় দিয়ে তখ্খুনি তুলে নিবি তোর পিঠে। সে চীৎকার ক'রবে, হাত-পা ছুঁড়বে, লেকিন, আমি তো ততক্ষণে তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছি। আমি দু'টো হাতে

জাপ্‌টে ধ'রবো,—পালাবে কী করে ? তুই ছুটে চলবি জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলে এসে পৌঁছতে পারলে আর ভয় কী ! খাপসুরৎ জওয়ানী তখন আমার !

হেসে ব'ললাম,—জওয়ানী তুমিতো পেয়েছিলে আব্বাসী !

সে বললে—বেশক্। পেয়েছিলাম। লেকিন, সে পাওয়ার মধ্যে জুবেদার কোনো হাত ছিল না ব'লে মনটা তেমন ভরে নি। কোথায় যেন একটা আফশোস থেকে গিয়েছিল মনের ভিতরে। দীন মহম্মদ সাহেব সঙ্গে ক'রে ওকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলো থেকে, কিন্তু তার বদলে, কুঁয়োতলা থেকে শুঁড় দিয়ে যদি ওকে তুলে নিয়ে আসত জুবেদা !—তাহলে কী হতো ? হাত-পা ছুঁড়তো, চীৎকার করতো, কাঁদতো,—আর আমি জাপ্‌টে ধ'রতে গেলে, নখ দিয়ে আঁচ্‌ড়ে, কি কাম্‌ড়ে অস্থির করে তুলতো বনের চিতাবাঘের বাচ্চার মতো !

এইখানে আব্বাসী একটু থামলো। হয়তো ভাবলো, আমি কোনো প্রশ্ন করলেও করতে পারি। কিন্তু, আমি রইলাম নীরব হয়ে। ও আবার কথা শুরু ক'রল। বললে,—সেদিন জুবেদার কাছে গিয়ে ওকে আদর করছি, আর ছাই-পাঁশ বক্‌ছি,—এমন সময়, সেই যে সোরগোলটা হচ্ছিল, সেটা যেন আরও জোরদার হয়ে উঠল হঠাৎ। চম্‌কে, ঘুরে তাকাতেই, কানে এলো দীন মহম্মদ সাহেবের নাম। কারা যেন ওঁর নাম ধ'রেই কী-সব ব'লছে উত্তেজিত হ'য়ে। তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম জুবেদাকে ছেড়ে।

গোলমালটা হচ্ছিলো হাতীঘরের অন্য দিকে। একটু দূর থেকেই বুঝলাম, পোষা মদ্দা হাতী—যেটাকে কিছুদিন হ'লো আনা হ'য়েছিল আমাদের গাঁয়ে, সে হাতিটা 'মস্ত্‌' হয়ে গেছে। তাকে বড়ো-বড়ো শিকল আর দড়ি দিয়ে হুঁসিয়ার ক'রে বাঁধা হ'য়েছে। তার কান দু'টো থেকে যে গন্ধ বেরিয়েছে, সে গন্ধ বেশ দূর থেকেই টের

পাওয়া যায়। তার ওপরে মাঝে মাঝে কেমন চাপা গলায় হাতীটা ডেকে উঠছে। তার ঐ ডাক শুনে অন্য কুম্‌কীগুলো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে, শুঁড় দোলাচ্ছে, আর তাদের ছোট-ছোট চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে। এক লহমায় বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। বুঝে ফেললাম, আমার জুবেদাই বা অতো খুসী-খুসী হ'য়ে উঠেছে কেন হঠাৎ! জওয়ানী জুবেদা, জওয়ানের ডাক শুনতে পেয়েছে, তাই এতো চঞ্চল! এখন হয়তো আমার কথাও সে ভালো ক'রে শুনবে না, এখন হয়তো শিকল ছেঁড়ার চেষ্টা করবে সে,—আমার সুতোর বাঁধন আর সে মানবে না!

এইসব ভাবতে ভাবতে 'মস্ত্‌' হাতীটার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ অদূরে একটা ছোট্ট ভীড়ের মতো দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম। মনে হলো, কাকে যেন সবাই ধরাধরি ক'রে বাইরে নিয়ে আসছে।

অমনি ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা। দীন মহম্মদ সাহেবের নামটা শুন্‌ছিলাম, তা'হলে দীনমহম্মদ সাহেবেরই কিছু হ'লো নাকি!

কথাটা মনে হ'তেই বুকটা কেঁপে উঠল। একটা বোবা কান্না যেন কণ্ঠটাকে চেপে ধ'রল। কোনক্রমে ভীড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখি,—যা ভেবেছি, ঠিক তাই! বাউরা হাতীটা সাহেবের একটা পায়ে কী করে যেন ঠোকর দিয়েছে। ডান পায়ের পাতাটার একটা ধার থেকে রক্ত পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঘাসের ওপরে চন্দনের ফোঁটার মতো প'ড়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। আমি দেখেই ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলাম,—আ-ব্বা-জা-ন!

ততক্ষণে ওঁকে ঘাসের ওপরে শোয়ানো হয়েছে। জনাচারেক লোক ওঁর কাছে রইল, আর সবাই ছুটে যাচ্ছিল হাতীটার কাছে। হাতীটাকে এখনো শক্ত ক'রে বাঁধা হয়নি, দড়ি-দড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে প'ড়ে কোথায় গিয়ে কার কী ক্ষতি করবে, কে জানে! ওকে আগে

সাম্‌লানো দরকার। এই ভেবে যারা এগিয়ে যাচ্ছিল, আমার চীৎকারে তারা থম্‌কে দাঁড়ালো। ভ্রূগুলো কুঁচ্‌কে যেন আমাকে ধমক দিতে চায় তারা। বলতে চায়,—কী এমন হয়েছে যে, ঐ রকম করে কেঁদে উঠ্‌লে? জঙ্গলে এ-সব দুর্ঘটনা তো কিছুই নয়!

কিন্তু ওরা তো জানে না,—আমার জীবনে দীনমহম্মদ সাহেব কতোখানি! কে আমাকে ছোট থেকে বড়ো করলো? কে আমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেছে? সাহেব যে আমার বাপ-মা—দুই-ই!

কেঁদে সাহেবের কাছে ব'সে পড়তেই উনি দু'টি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে,—আঘাতের যন্ত্রণায় মুখখানিতে ফুটে উঠেছে একটা ক্লিষ্ট ভাব—তার ওপরে হাসি টেনে এনে ব'লে উঠলেন, ভয় পাস্‌ না বেটা, কিচ্ছু হয়নি আমার। জঙ্গলে এক রকম লতা আছে, তার পাতা আনতে গেছে একটা লোক। সেই পাতার রস লাগালেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হাতাটার দোষ নেই, আমি পিছনে ছিলাম, ও বুঝতে পারে নি। ভাগ্যিস, ওর পায়ের চাপ সবটা লাগেনি, তা'হলে আমার পা এতক্ষণে থেৎলে যেতো।

কান্নাভরা কণ্ঠেই ব'লে উঠলাম,—সত্যি ব'লছেন, কিছু হয়নি।

—না রে, না!—বলে ডেকে উঠলেন রফিক চাচাকে।

রফিক চাচা হাতীটাকে বাঁধতে গিয়েছিল, সেখানে থেকেই সাড়া দিয়ে বলল,—কী ব'লছ?

—হুঁসিয়ার!—সাহেব ব'ললে,—ওর শুঁড়ের সামনে পড়িস্‌ না যেন! ভালো ক'রে পা চারটেতে বাঁধন দে; আর খবরদার, ওর কানে হাত দিস্‌ না যেন এখন! আরও ক্ষেপে যাবে।

এইসব নির্দেশ দিচ্ছেন, ওদিকে ডান পায়ের ক্ষতস্থানটা থেকে রক্ত ঠিকই ঝরে যাচ্ছে। অবশ্য, কয়েকমুহূর্ত পরেই জংলীদের একটা লোক বন থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এলো কী-সব লতাপাতা

নিয়ে। সেই সব লতা-পাতা দু'হাতের পাতায় ঘসে ওঁর পায়ে লাগিয়ে দেওয়া হ'লো। তারপরে ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে এসে শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া হ'লো। রক্ত কিন্তু সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে,—দীনমহম্মদ সাহেব উঠে ব'সলেন। ব'সে, ঘাসের-ওপরে ঝরে-যাওয়া চাপ চাপ রক্তের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন,—বেশ রক্ত প'ড়েছে দেখ্‌ছি! ভোগাবে। শরীর দুব্‌বলা ক'রে দেবে।

তারপরে কণ্ঠে জোর এনে উঁচু গলায় ডেকে উঠলেন,—রফিক?

রফিক চাচা সাড়া দিয়ে ওঁর কাছে দাঁড়ালো। সাহেব ব'ললেন—ঠিক আছে সব?

—হ্যাঁ।

আবার ব'ললেন—এবার একটা কাজ কর্‌। কুম্‌কীগুলোকে অন্য দিকে নিয়ে যা। ধারে-কাছে কুম্‌কী রাখার দরকার নেই। পরে না-হয় ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।

রফিক চাচা ব'ললে—ঠিক আছে।

আমাকে সাহেব ব'ললেন,—যা'তো আব্বাসী, তোর জুবেদাকে অন্য জায়গায় বেঁধে রেখে আয়। রফিক যেখানে অন্য কুম্‌কীদের রাখবে তার কাছাকাছিই যেন থাকে, বুঝ'ল? জায়গাটা ছায়া-ছায়া হওয়া চাই।

আদেশ পালন ক'রতে চ'ললাম আমরা। বড়ো জোর আধ ঘণ্টা সময় চলে গেছে, এরই মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে এলাম সাহেবের কাছে। দেখি, কে বুঝি একটা চৌপায়া এনে দিয়েছে, সেই চৌপায়াটা একটা গাছের ছায়ায় টেনে নিয়ে বসে আছেন দীনমহম্মদ সাহেব। আমাকে দেখেই কাছে ডাকলেন, ব'ললেন,—হয়েছে? এবার ঘর যা।

ব'ললাম,—আপনি যাবেন না!

উনি একটু অবাক হ'য়েই বুঝি তাকালেন আমার দিকে, ব'ললেন,

—আমি তখন যাবো কেন? আমার কাজ নেই? এখানে বসে-বসেই সব করিয়ে নিচ্ছি, দেখ না!

বল'লাম—আপনার তবিয়ৎ ভালো নেই।

হো-হো করে হেসে উঠলেন সাহেব। বলে উঠলেন,—খুব ভালো আছে তবিয়ৎ। তুই ঘরে যা'—তোর যাওয়া দরকার—আমি ঠিক সময়েই গিয়ে হাজির হবো।

বাড়ীর কথায় নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি মনটা নেচে উঠ্‌তে চায়। সেটা বুঝা মাত্র আরও লজ্জা পেলাম। বাড়ী মানে ত আর শুধু আমাদের সেই ঘর দু'খানাই নয়, বাড়ী মানে—একটি মেয়ে, বাড়ী মানে—সেই শয়তানী।

কথাটা যত মনে হচ্ছে, তত সংকোচ হচ্ছে। সাহেবের পায়ের কাছে বসে পড়লাম—দেখি, কেমন আছে পা-টা!

ন্যাকড়া দিয়ে পট্টি-বাঁধা পা-খানা একটু সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন প্রথমে, তারপরে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হেসে ফেললেন—বড়ো স্নেহভরা সেই হাসি। কোমল কণ্ঠে বললেন—ভাবিস না। কিছু হয়নি আমার। বাড়ীতে মেয়েটা একা-একা রয়েছে, না?

—কিন্তু, আমি গিয়ে কী করবো?

—কথা শোনো ছেলের!—সাহেব বললেন,—তোর জরু, তুই গিয়ে দেখ্‌ভাল করবি না? নতুন এসেছে, ওর মনটা যাতে ভালো থাকে সেটা দেখবি না তুই?

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন—চলে যা। তোর বউকে গিয়ে বলবি, আজ রাতে দশজন মানুষ খাবে, রান্নার যোগাড় করে যেন। আমি কিছুক্ষণ পরেই বকরীর মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছি। শহরেও লোক পাঠাচ্ছি, আর সব মশলা-টশলা, তরকারিপাতি নিয়ে আসবে।

একটু অবাক হয়েই বললাম—এ-সব কেন বাবা?

বললেন—তোর বিয়ের ভোজ দিতে হবে না? সবাই ধরেছে যে! ভালো কথা, বাংলোয় গিয়ে ওর বাপকে নেমন্তন্ন করে আসিস।

অগত্যা মাথা নীচু করে উঠেই চলে আসছিলাম, সাহেব পিছন থেকে ডাকলেন,—শোন!

কাছে গেলাম। বললেন—তোর বউকে বলবি, বেশী-কিছু যেন না করে। স্রেফ্ বিরিয়ানী করতে বলবি।

বিরিয়ানী! সে তো বছরে এক-আধ দিন রফিক-চাচা শখ করে রান্না করত, আর নেমন্তন্ন করে আমাদের খাওয়াত! পাঁঠার মাংস, চাল, ঘি, আর-আর কী-সব মশলা দিয়ে তৈরী, সে এক অতি মুখরোচক খাদ্য! রফিক-চাচার দৌলতে জংলীমানুষ জনকয়েক মাত্র তার আস্বাদ পেয়েছে; কিন্তু রান্না করতে পারবে কে? শয়তানীই বা জানবে কী করে বিরিয়ানী রান্নার বৃত্তান্ত?

সবিস্ময়ে বললাম—আব্বাজান! ও কী বিরিয়ানী করতে পারবে?

—খুব পারবে!—সাহেব হেসে বললেন—ঘরে গিয়ে ওকে বল, দেখবি কোমর বেঁধে ও কাজে লেগে গেছে। বাংলোয় থাকতে-থাকতে এ-সব ও খুব শিখে গেছে!

একটু ভার-ভার মন নিয়েই বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। অদূরে গাছের ছায়ায় মোটা দড়িতে জুবেদা বাঁধা রয়েছে, আমাকে দেখতেও পেয়েছে বুঝি! শুঁড় দুলিয়ে-দুলিয়ে ডাকছে বুঝি আমাকে?

ছুটে গেলাম। ওকে আদর করতে করতে ডাকতে লাগলাম—জুবেদা!

জুবেদার চোখদুটি খুশীতে বুজে এলো।

যে-লোকটি হাতীদের নাস্তা-টাস্তা তৈরী করে দেয়, সে-লোকটি কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন। আমাকে জুবেদার কাছে দেখে থমকে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের পাগলামী বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকেই দেখল। তারপরে এক সময় বললো,—এ—ই আব্বাসী, দীন সাহেব কী বললেন তোকে? বাড়ী যেতে বললেন না?

সচকিত হয়ে উঠলাম ওর কথায়। তার উপরে রাগ করেই বললাম,—সে আমাকে বলেছেন আমি বুঝবো, তোর কী রে!

লোকটি ঠোঁট উল্‌টে বললে—আমার আর কী! তোর বাড়ীর কাছ থেকেই আসছিলাম ফিরে। দেখলাম, বাংলোর বুড়োটা তোর বাড়ীর দাওয়ায় বসে তোর মেয়েমানুষটির সঙ্গে কী-সব গুজুর-গুজুর, ফুস্থর-ফুস্থর-করছে।

আরও রেগে গেলাম কথাটা শুনে। বললাম,—ঐ বুড়োটা ওর বাপ, তা জানিস?

লোকটা দাঁত বার করে হাসলো। কোণের দিকের একটা দাঁত বিশ্রীরকম লম্বা, হাসলে বীভৎস দেখায়। বললে—জানবো না কেন? বাপ মেয়েকে দিয়ে কী করায়, তা-ও জানি। বাংলোয় এখন লোক নেই তাই; নইলে, ও কি ঘর করবার মেয়ে? বাংলোয় লোক আস্থক, তখন আর দেখতে হবে না; চিড়িয়া উড়্‌ল বলে!

ওর কথার ধরনে আমার মাথায় ততক্ষণে রক্ত উঠে গেছে। যে কথাটা ও বলছে, তা' যে মিথ্যে, তা নয়—তবু ওর মুখে ও-সব শুনতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কথাটা ও যেইমাত্র শেষ করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাস্‌ করে বসিয়ে দিয়েছি একটা চড় ওর গালে।

আচম্‌কা এ-প্রহারের জন্য ও-প্রস্তুত ছিল। ছ'পা পিছিয়ে গিয়ে গালটায় হাত দিলো। ঠোঁটের বাঁ-কোণ থেকে খানিকটা রক্ত বেরুলো গল্‌গল্‌ করে। সেটা থুথুর সঙ্গে ফেলে দিয়ে, মুখটা

মুছে আমার দিকে তাকালো। রীতিমত দশাসই চেহারা, তার ওপরে জংলী। আমাকে এক ঘুঁষিতে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু, সে কিছুই করলো না,—শুধু বন্য দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। সে দৃষ্টি এত ধারালো যে, তার চোখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মতো চাপা গলায় সে শুধু বললে, —এর বদ্‌লা আমি নেবোই।

তখন আমার মাথাটা ঠিক ছিল না বললেই চলে। বলে উঠলাম,— যা-যা, দেখা যাবে!

চলে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, বললে—আমাদের জংলী ভাষায় আমার যে-নাম, তার মানে জানিস? গুণ্ডা। ক্ষেপে গেলে কাউকে রেহাই দেই না। আমাকে তুই ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস, মনে থাকে যেন!

বলে উঠলাম—ক্ষেপে উঠে ভা-রী করবি আমার!

গুণ্ডা দাঁতে দাঁত চেপে বললে—কী করবো, তা' ঠিক সময়েই দেখতে পাবি।

লম্বা-লম্বা পা ফেলেই চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ডেকে বললাম,—কাজ তো তোর হাতী-খাওয়ানো! যদি জুবেদাকে জহর খাইয়ে মেরে ফেলিস তো, সরকারী হাতী, সরকারী লোক এসে তোকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

আবার ফিরে দাঁড়ালো। মুখখানা ঘেন্নায় বিকৃত হয়ে গেছে। থুথু ফেলছে থু-থু করে। তারপরে বললে—গুণ্ডা মরদ, আওরৎ নয়। আমার কাছে খুনের বদ্‌লা খুন। অন্য কিছু নয়।

বলতে-বলতে এগিয়ে গেল সে। গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জুবেদা শুঁড় তুলে-তুলে তেমনি খেলা করছে, এ-সব যা হলো,

তাতে ওর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ওর ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, ও সবই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুঝেও এসব ব্যাপারে আমল দিতেও নারাজ!

ওর দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ মনের মধ্যে আরেকটা চিন্তা জেগে উঠল বিজ্‌লী-ঝলকের মতো। মনে হলো, শয়তানী যখন সব কথা শুনবে, সেও কি এম্‌নি চুপচাপ থাকবে? এমন ভাব করবে,—যেন একটি কথাও তার কানে যায় নি?

চিন্তাটা এমন ভাবে আমাকে পেয়ে বসলো যে, আমি আর থাকতে পারলাম না। জুবেদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সত্যিসত্যি এগিয়ে চললাম বাড়ীর দিকে। মাথার ওপরকার গাছগুলোর পাতার ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপরে, হাওয়া লেগে ছায়ারা সব কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। একটা ছায়া-পাখী আরেকটা ছায়া-পাখীর পিছনে উড়ে গেল। মুখ তুলে কায়া দেখতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। কোন্ গাছের কোন্ ডালের আড়ালে যে তুটিতে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ল, কে জানে!

মুখ নীচু করে আবার এগিয়ে চলেছি গাছ-পাতা আর ডালের ছায়ার ওপর পা ফেলে-ফেলে,—এক সময় মুখ তুলতেই, চমকে, থেমে যেতে হলো! ভিতরকার খুশী-হওয়া মনটা আপনিই বলে উঠলো,—বাঃ!

আমাদের বাড়ীর দাওয়ার ওপরে দড়ি টানিয়ে ভিজে একটা শাড়ী শুকোতে দিয়েছে। আকাশের নীল-নীল রঙ্, আর আশে-পাশের সবুজ রঙ্—তার মাঝখানে শাড়ীর টকটকে লাল রঙ্টা হাওয়ায় হাওয়ায় এক অদ্ভুত খুসীর নিশান উড়িয়ে দিয়েছে!

আমাদের ঘরের দাওয়ায় শাড়ী ঝুলছে, এ-দৃশ্য আগে কেউ কখনো দেখে নি। আমার মনটা মুহূর্তে এমন এক পাগ্‌লামীতে ভরে গেল যে, মনে হলো ছুটে চলে যাই শাড়ীটার কাছে—

শাড়ীটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি,—এতো উজ্জ্বল রঙ্‌ ও পেলো কোথা থেকে ?

কিন্তু কাছে যেতেই, শাড়ীর আড়াল থেকে আরেকজন এসে দাঁড়ালো সামনে। বললে—তুমি আসছ, দূর থেকেই আমি টের পেয়েছি।

বাবুজী, আপনাকে বলব কী, সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, শয়তানী নয়, যেন বেহেস্ত্‌ থেকে এক হুরী কি পরী এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। চান করে ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে, আর এক-গোছা চুল টেনে নিয়ে এসেছে বুকের ওপরে। আগে যেটা পরে ছিল সে শাড়ীটা বদ্‌লে নীল-নীল শাড়ী পরেছে একটা। ওর পুঁটলীতে ক'টা শাড়ী ছিল জানিনা, জানিনা আরও কী-কী ও এনেছিল বাংলো থেকে পুঁট্‌লী বেঁধে। একটা সুমিষ্ট গন্ধ পেলাম নাকে, বাংলোর কুঁয়োতলা দিয়ে আসতে-আসতে এ-ধরনের গন্ধ আগে-আগেও পেয়েছি। বাংলোর সাহেবরা কেউ কুঁয়োতলায় চান করে গেলেই এ-গন্ধ পাওয়া যেতো।

বুঝলাম, কোনো সাহেবের কাছ থেকে কোনো ভালো সাবান ও উপহার পেয়ে থাকবে। সেই সাবান দিয়ে চান করেছে আজ আমাদের ঘরে এসে।

মনটা মেতে উঠলো। জওয়ানী আওরৎ সদ্য চান করে কাছে এলে যে এতো ভালো লাগে, তা' কি জানতাম ? তার ওপরে ওর ঐ 'তুই' না বলে 'তুমি' সম্বোধনটা কানে যেন মধুবর্ষণ করলে।

ঘরে উঠে এসে দেখি, আমার ঘর, আব্বাজানের ঘর,—দুটো ঘরেরই চেহারা ফিরে গেছে। ঘর-দোর সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে ও-যে এতো চৌকস, তা-ও আমি জানতাম না। বলার কথা ছিল—দীনসাহেব জখম হয়েছেন ; বলার কথা ছিল—রাতে বিরিয়ানী রান্না করতে হবে, সে রান্না তুমি জানো কিনা ? সে-সব

কিছুই বলা হলো না। ঘরের ভিতরকার খাটিয়ার ঝপ্ করে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম অদ্ভুত এক কথা,—তোমার সাবান আছে বুঝি? ভালো সাবান?

অবাক হয়ে কৌতুকের সঙ্গেই তাকালো আমার দিকে। তারপর, হঠাৎ সাবানের কথা কেন, এটা বুঝতে পেরেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠলো। বললে,—হুঁস্ তো আছে দেখ্ছি! নসীব আমার ভালো বলতে হবে!

চোখ তুলে তাকালাম ওর চোখের দিকে, জিজ্ঞেস করলাম,—কেন?

ও বললে—যার ঘর করতে এলাম, সে আমার দামটা বুঝবে।

—তাই নাকি?

ও বললে—সাবান দিয়ে চান করেছি, সেটা বুঝে তো ফেললে!

—তা' তো ফেলবই। আশ্চর্য কী!

ও বললে—জংলীরা বোঝে না, বোঝে সাহেবরা!

বলতে বলতে আবার হেসে ফেললো, বললে—তুই সাহেব হচ্ছিস বুঝি?

উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টান দিলাম, এসে পড়ল বুকের ওপর নিজকে ছাড়িয়ে নিলো না। আমিও তখন আত্মহারা। আমার চেতনার সামনে থেকে সব-কিছু মুছে গেছে! শুধু দেখতে পাচ্ছি, ওর দুটো ঠোঁট, ভিতরের দিকে গোলাপী-গোলাপী রঙ্, আর সেই রঙে হঠাৎ যেন ঢেউ জেগেছে! কিন্তু, পরমুহূর্তেই ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল সেই ঢেউ—রক্তে রক্তে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার ঢেউয়ের কণা। হাত ছাড়িয়ে ও ছিট্‌কে সরে গেল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, শাড়ীর আঁচলটা ঠিক ক'রে দিয়ে দুটি চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে, অস্ফুট চাপা গলায় বলে উঠল—দুষ্টু!

ব'লে আর দাঁড়ালো না, নাচ্‌নে-ওয়ালীদের মতো সারা শরীরে একটা ঘুর্ণি তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এলো বেশ কিছুক্ষণ পরে। বললে,—কুঁয়োতলায় এসো।

একটু চম্‌কে উঠেই জিজ্ঞেস করলাম—কোন্ কুঁয়োতলায় ?

মুখ টিপে আবার একটু হাসলো, বললে—বাংলোর কুঁয়োতলায় নয়, তোমাদের বাড়ীরই কুঁয়োতলা। এসো, চান করবে না ?

—তা' মন্দ হয় না। অনেক কাজ আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে গামছা-লুঙি, এ সব খুঁজছি,—ও বললে—সব কুঁয়োতলায় রেখে এসেছি।

—লক্ষ্মী মেয়ে!—বলে, কুঁয়োতলায় এসে দেখি, জল তুলে পিঁড়ি পর্যন্ত পেতে রেখেছে। এমন কি, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, একটা সাদা রঙের দামী সাবান পর্যন্ত পিঁড়ির কাছে গুছিয়ে রেখেছে।

বললাম—ওটা কী !

মুখ টিপে হাসল, বললো,—সাবান। —আমার।

বললাম—না-না, ও-সবে দরকার নেই।

—খুব দরকার আছে। বোসো দেখি,—বলে, একরকম জোর করে পিঁড়িতে বসিয়েই মাথায় জল ঢেলে দিলে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ওকী করছো! কেউ যদি—

ও হেসে বললে—আবার লজ্জাও আছে দেখছি। কেউ দেখবে না, তুমি বোসো—আমি তোমায় সাবান মাখিয়ে দি। —'না না!'-করে যতো চীৎকার করি, ওর জেদ তত বেড়ে যায়। আমার পিছনে গিয়ে আমার পিঠে জোরে জোরে সাবান ঘষ্‌তে থাকে। বললাম—আব্বাজান এসে পড়েন যদি।

ও বললে—দেরী আছে আসতে। জখম হয়েছেন না !

চম্‌কে উঠলাম। বললাম—তুমি জানলে কী করে ?

ও বললে—জানি। আমার বাপু এসেছিল যে একটু আগে।

—সে কোথা থেকে খোঁজ পেলে ?

বললে—কারুর কাছে শুনেছে হয়তো।

তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে আরও বললে—রাতে তোমার বিয়ের ভোজ বুঝি ?

—এ-ও শুনেছ ?

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল; বললে,—দীন সাহেব তোমাকে আর চেনেন না। কোথায় তাড়াতাড়ি এসে খবরটা আমায় দেবে, তা না, জুবেদাকে নিয়েই মেতে রইলে। ভাগ্যিস বাপু গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

বললাম—বিরিয়ানী রাঁধবার হুকুম হয়েছে; পারবে রাঁধতে ?

ঠোঁট উল্‌টে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ভা-রী তো বিরিয়ানী! কোর্মা, কাবাব কী চাও বলো না ? ঠিক বানিয়ে দেবো।

—সবই শিখেছ বাংলো থেকে।

ও বললে—আর কোত্থেকে শিখবো ? শহর থেকে ? শহরে থেকেছি কোনোদিন ?

—যাবে আমার সঙ্গে ?

চোখ পাকিয়ে তাকালো আমার দিকে, বললে—বাস্‌রে, একেবারে গলে গেলি যে !

'তুই' করে কথা বললে সহজ হয়ে যায় মনটা। মাঝে মাঝে 'তুমি' করে বলে, আর আমার যেন কেমন হয়ে যায়, মনে হয় শহরে গিয়ের সাহেবদের মেয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছি বুঝি।

বেশী বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, সে রাত্রে শাদীর ভোজ খুবই জমে উঠেছিল বাবুজী। ওর হাতের রান্না-করা বিরিয়ানী খেয়ে সবাই তারিফ করে ফিরে গেল। আর, খাওয়া-দাওয়ার পর যখন আমার

ঘরে ও শুতে এলো, তখন আমার চোখ যেন ওর দিক থেকে ফিরতেই চায় না।

আঁচল ঢাকা দিয়ে গায়ের জামাটা ও খুলে ফেলছিল, মুখ ঘুরিয়ে সরম-লাগা গলায় বলে উঠল,—কী? দেখছ কী?

উঠে দাঁড়িয়ে ভয়-পাওয়া মানুষ যেমন ক'রে কথা বলে, তেমনি ভাবে বলতে লাগলাম,—যাবে না তো চলে? আমাকে হঠাৎ ফেলে রেখে?

হেসে উঠলো চাপা স্বরে। বললে—খুব ভয় হচ্ছে বুঝি?

ওর হাতখানা ধ'রে আমার মুখে-কপালে-গালে বুলোতে বুলোতে পাগলের মতো বলে উঠলাম,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই—ঠিক তাই।

চোখদুটো ওর কৌতুকে নেচে-নেচে উঠ্‌ছে। ঠোঁটের কোণে হাসির একটা ঝিলিক ফুটিয়ে বলতে লাগল শয়তানী,—একটা হাতীকে বশ করতে পারো, আর একটা জওয়ানীকে পারো না?

বললাম—হাতীর রীত্‌ জানি, কিন্তু জওয়ানীর?

—আস্তে আস্তে জেনে নেবে।

বললাম—জানবার আগেই যদি পালিয়ে যায়?

অল্প এটু হেসে উঠে ঝপ্‌ করে শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তারপর, আমার একটা হাত বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলতে লাগল,—পালাবো কী করে? আমার বাপু দীনসাহেবের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে না?

বললাম—তাহলে, টাকার জোরেই বাঁধা পড়েছ বুঝি?

—আবার কিসে?

কথাটা এতো স্পষ্ট, এতো জোরালো, যে, তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কথা বলতে পারলাম না। মনটাও বেশ দাম গেল।

ও বললে—বাতিটা নিভিয়ে দেবে না?

—দেবো।

কিন্তু দেওয়া আর হয় না। ঠায় বসে থাকি, আর ও-ও চুপচাপ পুতুলের মতো শুয়ে থাকে কোলে মাথা রেখে। আকাশে দেরী করে চাঁদ উঠল আজ এই এতক্ষণে। টুক্‌রো চাঁদ,—কেমন যেন আব্‌ছা-আব্‌ছা তার আলো। বন থেকে গভীর রাতে যে পাখী কটর্‌-কটর্‌ ক'রে ডাকে, সেই পাখী ডেকে উঠলো।

ও একসময় একটু সচকিত হয়ে বললে—চন্দনের গন্ধ আসছে,—না? চন্দন-কাঠের বনও ছিল আমাদের ঐ দিকে। বাতাস যে ঠিক তার গন্ধ নিয়ে ব'য়ে বেড়ায় এমন নয়, তবে, দিনের পর দিন যারা বনে থাকে, তারা হাওয়ায়-হাওয়ায় এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কোন্‌টা কোন্‌ গাছের হাওয়া, তা' বলে দিতে পারে। ঝাউ গাছের যেমন একধরনের সুবাস আছে, তেমনি সেগুন গাছের আছে, আর তেমনি আছে চন্দন গাছের। আপনারা বুঝবেন না, কিন্তু আমরা বুঝতাম। হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে আসতো বনের খবর।

যাই হোক, ওর কথার উত্তরে বললাম—তাই তো মনে হচ্ছে।

ও মাথা তুলে উঠে বসলো। তারপর বললে—এবার শুয়ে পড়ো, আর রাত জেগে কাজ নেই।

বললাম—যদি বলি, সারাটা রাত আজ জাগতে ইচ্ছা করছে?

মুখ টিপে হাসলো, দুটি হাত মাথার কাছে উঠিয়ে আল্‌গা খোঁপাটা ঠিক করলো। তারপর কোমল কণ্ঠে বললে—শোও না? আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই, এখ্‌খুনি ঘুম এসে যাবে।

তা-ই হলো। আমার মাথার চুলে, ধীরে ধীরে হাতখানা ছুঁইয়ে যেতে লাগল, আর আবেশে আমর চোখদুটি বুজে আসতে চাইল।

অনেক—অনেক মুহূর্ত কেটে যাবার পর, আমি অনুভব করলাম, ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপরে বললে—দীন সাহেব তো তোমার শাদী বলে খুব আমোদ-আহ্লাদ করলেন সবাইকে নিয়ে। কিন্তু, ওঁর পা-টা কেমন ফুলে উঠেছে দেখেছ? চুপ করে শুয়ে

আছেন, মুখে রা-টুকুও নেই। অথচ, যন্ত্রণা কি কম হচ্ছে? মুখ বুজে সব সহ্য করছেন।

পরে দেখেছিলাম, মেয়েটার কথার কথা নয় এ-সবগুলো, দীনমহম্মদ সাহেবকে রীতিমত সেবা করতে আরম্ভ করল ও। আমার শাদীর পরদিন থেকে দীন সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না,—অসহ্য ব্যথা করছে পায়ে। বন থেকে কী-এক ধরনের লতা-পাতা নিয়ে আসছে জংলীরা, সে-সব হাতের তালুতে ঘ'সে-ঘ'সে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে যন্ত্রণা একটু কমলেও, সবটুকু সেরে গেল কী?

বিছানায় শুয়ে শুয়েই উনি লোকজনদের ডেকে পাঠান; কাকে কী করতে হবে, বলে দেন। তিনদিন পরে শোনা গেল, মস্ত্ হাতীটার পাগলামী সেরে গেছে, আগের মতোই শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে সে। তার ধরন-ধারণ সব শুনে নিয়ে দীনমহম্মদ সাহেব বললেন—আর ভয় নেই, খুলে দে ওকে। সঙ্গে একটা কুম্‌কীকে ছেড়ে দে। ওরা ছুটিতে মিলে বনে-বাদাড়ে একটু ঘুরে আসুক।

—তারপর? যদি না ফেরে?

হাসলেন আব্বাজান। বললেন—ফিরবেই। ওরা বনের ভিতরেও যাবে না, বনে গিয়ে হারাবেও না।

লোকটা চলে গেল। আমি ওঁর কাছেই বসে আছি, এমন সময় ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো শয়তানী। হাতে একগেলাস গরম দুধ। আব্বাজানের শিয়রের কাছে ব'সে ওকে খাওয়াতে লাগলো চুপচাপ।

আব্বাজান বললেন—তুই সচ্‌মুচ্ আমার বেটি ছিলি ভিন্ জনমে।

শয়তানী উত্তরে করল কী,—মুখ টিপে অল্প একটু হেসে, আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকালো, তারপরে দীন সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল,—ওকে সেটা একটু বুঝিয়ে বলুন না, আব্বাজান।

ও বলে, আমার বাবাকে নাকি আমি ভালভাবে দেখি না, সেবা করি না!

ব'লেই আর দাঁড়ালো না, ছুটে পালালো ঘর থেকে। খুশীর আভায় দীন সাহেবের ফ্যাকাশে মুখখানা ঝলমল করে উঠলো। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরও বুঝি কেঁপে গেল। ডাকলেন—আব্বাসী, কাছে আয়।

গেলাম। উনি আমার মাথায় হাতখানা রেখে বললেন,—তোর বউ খুব ভালো মেয়ে। আমার যেমন সেবা করে, তেমন সেবা নিজের মেয়েও করতো না। ওকে তোর হাতে তুলে দিয়েছি আমি, ওকে যত্ন করিস, বকাঝকা করিস না।

থামলেন। আমি মাথা নীচু করে চুপচাপ ওর কথা শুনছি। উনি একটু দম নিয়ে আবার বললেন—আর একটা কথা। জুবেদাকেও দেখিস। খানাপিনা খানাদারের হাতেই ছেড়ে দিস না, নিজে তদ্বির করে সব কিছু করবি। যখন থেকে সেই লোকটি চলে গেছে ওঁর কাছ থেকে হুকুম নিয়ে 'মস্ত্' হাতীটার কাছে একটা 'কুম্‌কী'কে ছেড়ে দেবার জন্য, ঠিক তখন থেকে আমার মনের মধ্যে জুবেদার কথাটাই ঘোরাফেরা করছিল। তাই দীন সাহেব জুবেদার কথা তোলামাত্রই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বললাম—আমি যাই আব্বাজান, জুবেদাকে দেখে আসি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতেই উনি পিছন থেকে তাড়াতাড়ি ডাকলেন,—ওরে শোন্, জুবেদার কাছে যাস্‌নি সকালে?

—গেছি ত?

উনি বললেন—তবে? নাইবার সময় এখনো হয়নি। এখন জুবেদার কাছে না গিয়ে আমার কাছে একটু বোস্।

ওঁর কথার অবাধ্য হতে পারি না, তাই পায়ে-পায়ে আবার এসে বসালাম ওঁর কাছে। উনি বলতে লাগলেন—আমার অন্তেকাল এসে গেছে। আমি আর বাঁচবো না।

—ও কী কথা বলছেন আপনি!

উনি ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—উমরও ত কম হয়নি। তার ওপরে এই বিমার। আমি সারবো না।

ওঁর কথার মধ্যে এমন একটা ব্যথার সুর ছিল যে, আমার মনটাকেও এসে সমান ভাবে ছুঁয়ে গেল। ছোট থেকে আমিই বা আর কাকে জানি, ইনি ছাড়া?

কাঁপাগলায় বলে উঠলাম—আব্বাজান!

উনি বললেন—কী রে?

বললাম—বিমার কেন সারবে না? আমি শহর থেকে ডাগ্‌দর সাহেবকে ডেকে আনবো।

উনি আবার তেমনি ভাবে ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি টেনে আনলেন, বললেন—ডাগ্‌দর সাহাব এসে কিছুই করতে পারবে না!

রাগ করে বললাম—কেন পারবে না? আপনি জংলী দাওয়াই দিচ্ছেন কেন?

উনি বললেন—সারবার হলে ঐ জংলী দাওয়াইতেই সারতো। হাতীর গায়ে চোট্ লাগলে, সেই চোট্ পর্যন্ত সেরে যায় ঐ জংলী 'মূলি'তে, তা জানিস্? শিখে রাখ্ বেটা। হাকিম-কবরেজের সাকরেদরা এই 'মূলি'র খোঁজে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলে সব আছে বেটা, জঙ্গলে কী নেই?

—আপনার তাহলে সারছে না কেন?

উনি বললেন—আমি হাতীর চোট্ সারাই আর নিজের চোট্ সারাতে পারছি না। এ-যে সারবার নয় বাবা! হাড়ের ভিতরে ঘুণ ধ'রে গেছে। এ-ও এক ধরনের 'বিমার'। হাতীদেরও হয়। একটা ঘটনা বলি শোন্ঃ সে অনেকদিন আগের কথা। তুই তখনো আসিস নি আমার কাছে। একটা মদ্দা হাতীকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বুনো হাতীদেরও তো দল থাকে।

হাতীটা পায়ে চোট্ পেয়েছিল, সে যতো দলের পিছু-পিছু যেতে চায়, তত তাকে সরিয়ে দেয় হাতীর সর্দার দাঁতের খোঁচা আর মাথার গোঁত্তা দিয়ে। মনে হচ্ছিল, তাকে আর দলে রাখতে চায় না সর্দার। হাতীটা করুণ স্বরে ডাকতে থাকে, তবু তার ওপর দলের কারুর মায়া হয় না। দলে ওর মা-বাবা-ভাই-বোন, কেউ-না-কেউ আছেই। তবু তাদের কারুর দরদ হয় না ওর ওপর। ও কি কোনো গুনাহ্ করেছিল? এমন কোনো 'গুনাহ্' —যার কোনো ক্ষমা নেই? পরে, তোকে কী আর বলব, হাতীটা দল ছাড়া একা-একা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মাঠের ওপর শুয়ে পড়লো। হায়েনার দল এসে কাম্ড়ায়, শকুন এসে ঠোক্রায়,—হাতীটা প্রথম-প্রথম উঠতে চেষ্টা করতো, হুঙ্কার দিতো, শুঁড় নাড়িয়ে সবাইকে তাড়াতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছুই করতে পারতো না। একদিন গিয়ে দেখি, মারা গেছে; চোখদুটো নেই, শকুনে খেয়ে ফেলেছে। শুঁড়ের অনেকটা অংশ নেই, হায়েনারা শেষ ক'রে দিয়ে গেছে। আমরা গিয়ে শকুন তাড়ালাম, শেয়াল তাড়ালাম, হায়েনা তাড়ালাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, হাতীটার দাঁত দুটো কেটে নিয়ে আসা। বেশী বড়ো দাঁত নয়, তাইতেই বুঝলাম, হাতীটার বয়স বেশী হবে না। সঙ্গে জংলীদের এক গাঁওবুড়ো ছিল, হাতীদের খবরাখবর তার খুবই জানা ছিল। সে ঘুরতে ঘুরতে হাতীর জখ্মী পা-টার কাছে এসে থাম্লো। পায়ে ঘা, পা-টা ফুলে আছে বিশ্রীভাবে। গাঁও-বুড়ো মন্তর-টন্তর-তুক্তাক জানতো —জংলীদের হাকিমও ছিল সে। করল কী, জানিস্? —ধারালো চক্চকে ছুরিখানা নিয়ে ঐ জখ্মী 'পা'-টার মাংসগুলো কেটে ফেলতে লাগল। কথায় বলে,—হাতীর পা। হাতীর পা কাটা কি অতো সহজ? গাঁও-বুড়ো তা-ই করলো। কাট্তে কাট্তে পা-খানির বেশ খানিকটা উঁচু পর্যন্ত কেটে ফেললো। তারপর, কী

যেন লক্ষ্য করে চম্‌কে উঠলো, বললে,—এইবার বুঝলাম, এদিকটা ছোঁয় নি কেন হায়েনা আর শেয়ালগুলো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার? গাঁও-বুড়ো বললে—জঙ্গলের রীতই হচ্ছে আলাদা। ওর পায়ে যে এই সর্বনাশা বিমার হয়েছে, পশুরা ঠিক তা বুঝে ফেলেছে! দল থেকে ওকে বাদ দিয়েছে, হায়েনা-শেয়ালে পর্যন্ত জখমের দিকটা মুখ দেয়নি। কেন জানিস? এই দেখ—

গাঁও-বুড়োর কথায় কৌতুহলী হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগলাম ব্যাপারটা। পায়ের হাড়টার চেহারা দেখে সারা শরীর ঘুলিয়ে উঠল আমার। দাঁতে পোকা ধরলে দাঁত যেমন বিশ্রীভাবে ক্ষয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে হাতীটার পায়ের বেশ কিছুটা হাড় ক্ষয়ে গেছে। গাঁও-বুড়ো বললে—এ-রোগ হলে কেউ বাঁচে না। এ হচ্ছে,—যাকে বলে,—'হাড়-ক্ষয়ে যাওয়া' রোগ!

বলতে বলতে সেদিন থেমে গিয়েছিলেন দীন সাহেব, তারপরে একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলেছিলেন,—আমারও হয়েছে সেই 'হাড়-ক্ষয়ে-যাওয়া'-রোগ,—যে' ক'দিন টিঁকে থাকি, সেই ক'দিনই রইলাম।

ওঁর কথার শেষের দিকে কখন যে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল শয়তানী, আমরা কেউ তা' খেয়াল করিনি। তাই ওর গলার স্বর আচমকা শুনতে পেয়ে আমরা চম্‌কে উঠলাম।

ও বললে—'হাড়-ক্ষয়ে-যাওয়া-রোগ' নয় বাবা, তাহলে, ব্যথায় আপনি 'উঃ! আঃ!' করতেন সব সময়।

দীন সাহেব তেমনি ভাবে অল্প-অল্প হাসতে লাগলেন ওর দিকে তাকিয়ে। কিছু বললেন না। ও এক রকম ছুটেই এসে দাঁড়ালো ওঁর শিয়রের কাছে। তারপরে হাঁটু মুড়ে বসে ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে বলতে লাগলো,—মামুলী জখম ছাড়া আর কিছু নয়, আমি

'হল্‌দি' গরম করে লাগিয়ে দিচ্ছি, পায়ের ফুলোটা এখ্‌খুনি কমে যাবে।

আশ্চর্য কাণ্ড! আমি সেই থেকে ঠায় বসে-বসে দেখলাম, হল্‌দি লাগানোর পর ফুলোটা সত্যিই একটু কম্‌তে আরম্ভ করলো, আব্বাজান যেন একটু আরামও পেলেন ওর এই দাওয়াইতে। হেসে বললেন— ও কী জাদু জানে নাকি রে?

মুচ্‌কি হেসে জাদুকরী বললে—আর কয়েকটা দিনমাত্র। আমি সেবা করে ঠিক আপনাকে সারিয়ে তুলবো।

আমার তখন আর বসার উপায় ছিল না। সূয্যি মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে জুবেদার খিদ্‌মদ্‌গারীর। তাই, 'পড়ি-কি-মরি' করে তাড়াতাড়ি ছুটলাম জুবেদার কাছে।

কিন্তু, গাছের নীচে, কোথায় জুবেদা!

আমার দেরী দেখে কেউ কি ওকে চান করাতে নিয়ে গেল?

গাঁয়ের এক প্রান্তে একটা বাঁধের মতো ছিল, সেখানে আমরা হাতীদের চান করাতাম। গিয়ে দেখি, হাতীর দলকে তখনো জলে নামানো হয়নি, কিন্তু জুবেদা নেমে গেছে জলে, আর তার পিছনে সেই 'মস্ত্‌' হাতীটা। মনের সুখে শুঁড় দিয়ে দিয়ে জল তুলে জুবেদার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে!

ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম মনে মনে। সেই যে লোকটিকে বাবা বলেছিল, সেই লোকটি এসে জুবেদাকেই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে 'মস্ত্‌' হাতীটার সাম্‌নে। ব্যাপারটা যে এমন-কিছু মারাত্মক তা' নয়, জুবেদা তো 'জওয়ানী' হয়েছেই, তবে আর এ শাদীতে আমার আপত্তি কী?

কিন্তু বাবুজী, মানুষ সব-কিছু বুঝতে পারলেও মনটাকে বশে আনতে পারে না। জুবেদাকে জলে ঐ 'মস্ত্‌' হাতীটার সঙ্গে

দেখে আমার যেন সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রাগে ! সেই লোকটা জলের ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জুবেদাদের রকম-সকমই লক্ষ্য করছিল,—আমি গিয়ে পিছন থেকে আচম্‌কা দিলাম এক ধাক্কা।

লোকটা জলে পড়ে গেল। সাঁতরাতে-সাঁতরাতে পরক্ষণেই ডাঙায় এসে উঠল বটে, কিন্তু এর জন্য সে তৈরী ছিল না। চোখ-মুখের জল হাত দিয়ে মুছতে-মুছতে সে আমার কাছে এলো, বললে—ধাক্কা দিলি যে ?

রাগে তখন সর্বশরীর জ্বলছে। বলে উঠলাম—বেশ করেছি !

অবাক হয়ে তাকালো আমার মুখের দিকে। সে বোধ হয় ব্যাপারটাকে কৌতুক হিসাবেই ধরেছিল, 'কুম্‌কী'দের শাদীর দিনে খিদ্‌মদ্‌গারদের মধ্যে এ-রকম হাসি-ঠাট্টার রেওয়াজ আছে। কিন্তু আমার মুখ দেখে তার ধারণা বদ্‌লে গেল। বললে—হয়েছে কী তোর ?

বললাম—জুবেদার শাদী দিতে তোকে কে বলেছিল ? অন্য 'কুম্‌কী' ছিল না ?

এইবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল লোকটা ! বললে—লাগলো কোথায় ? নিজে তো শাদী করেছিস একটা 'জওয়ানী'কে, আবার জুবেদার ওপর এত লোক-দেখানো দরদ কেন ?

চীৎকার করে বলে উঠলাম—চুপ কর্।

—ইস ! মেজাজ দেখ না !

লোকটার টুঁটি টিপে ধরতাম বোধ হয় তখ্‌খুনি, যদি না আমার আওয়াজ পেয়ে জুবেদা হঠাৎ শুঁড় তুলে কঁকিয়ে উঠ্‌তো।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলাম,—জুবেদা, উঠে আয়।

এবং আপনাকে তাজ্জবের বাত্ আর কী বলব বাবুজী, জুবেদা সত্যি সত্যি জল থেকে উঠে দাঁড়ালো।

লোকটা বললে—ডাকছিস কেন ওকে ?

—বেশ করছি। ভাগ্ এখান থেকে।

লোকটা বললে,—দীন সাহেব রাগ করলে আমি জানি না কিন্তু।

বলে উঠলাম—সত্যি বল তো? কে তোকে পরামর্শ দিয়েছে জুবেদাকে বার করবার?

ও বুঝি এবারও একটু চম্‌কে উঠলো। তারপরে আম্‌তা-আম্‌তা করে বললো,—কে আবার পরামর্শ দেবে?

ওর কথার ধরনে আরও সন্দেহ হলো। বললাম—তুই সাদাসিদে মানুষ, তোর মাথায় এ-সব বুদ্ধি গজাবে না! অন্য 'কুম্‌কী' থাকতে, নতুন-'জওয়ানী' জুবেদাকে নিয়ে টানাটানি করলি কেন তোরা? কে তোকে বুদ্ধি দিয়েছে?

লোকটা বললে—যে-ই দিক, দোষ কী হয়েছে বল্‌?

—হয় নি?—বলে উঠলাম—জুবেদা সবে জওয়ানী হয়েছে, এখনই ওর বাচ্চা হওয়া কি ভালো? এখানকার রীত্‌-নীত্‌ তুই জানিস না?

লোকটা নীচু গলায় এবার বলেই ফেললো কথাটা।

বললে,—কী করবো, 'গুণ্ডা' বললে যে!

'গুণ্ডা' লোকটি যে কে এবং কীরকম, তা-তো আপনাকে আগেই বলেছি বাবুজী! ও বলেছিল—'খুনের বদ্‌লা খুন' নেবে,—কিন্তু এটা সে কী করলো? শত্রুতা করবার এই-ই প্রথম ধাপ নাকি?

বললাম—কোথায় গুণ্ডা?

—কী জানি, কোথাও গেছে হয়তো!

আমি আর সময় নষ্ট না করে জলের ধারে নেমে এলাম। ডাকতে লাগলাম জুবেদাকে। জুবেদা উঠে এলো, কিন্তু পিছনে পিছনে সেই হাতীটাও চলে এলো। লোকটা চেঁচিয়ে বললে—হুঁসিয়ার আব্বাসী। ওর সামনে যেন পড়িস না। ওর 'দিমাগ' আবার খারাপ হয়ে যেতে কতক্ষণ?

আমি কিন্তু ওদের দিকে গেলাম না, ছুট্‌তে লাগলাম বিপরীত

দিকে। আরেকটা 'কুম্‌কী'কে ধ'রে এনে মস্ত্‌ হাতীটার সামনে দিতে পারলেই আমার মনের বাঞ্ছা পূরণ হয়ে যায়।

চান করবার জন্য 'কুম্‌কী'গুলোর শেকল খোলা হয়ে গেছে ততক্ষণে। যে-কুম্‌কীটা সেদিন 'মস্ত্‌' হাতীটার ডাক শুনে বার বার কান খাড়া করছিল আর খুসীতে শুঁড় নাড়ছিল, সেটাকে খুঁজে বার করলাম সবার আগে। তার মাহুতকে বললাম ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বাঁধের দিকে যেতে।

কাজটা কঠিন হবে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা' হলো না। এই 'কুম্‌কী'টা সহজেই 'মস্ত্‌'হাতীটার গা ঘেঁষতে লাগল। হাতীটা ওর দিকে মনোযোগ দিতেই আমি জুবেদাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনলাম অন্যদিকে। তারপর অন্যদিক থেকে জলে নামলাম ওকে নিয়ে। শুরু হলো ওর ডলাই-মলাই। জলের ওপর কাত হয়ে ও আমার সেবা নিতে লাগল। যেন শিশুর মতো খুসী হয়ে উঠ্‌ছে জুবেদা। ওর রকম-সকম দেখে মনে হতে লাগল 'মস্ত্‌'হাতীটাকে ওর একেবারেই মনে ধরেনি। যদি তাই হ'তো, তাহলে ওকে কি তার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম এত সহজে ?

কানে-কানে বললাম—জুবেদা, তোর শাদী দেবো সামনের বারে। সামনের বারে তুই আরও একটু বড়ো হবি।

ও যেন কথাটা আমার বুঝলো, ওর ছোট-ছোট চোখে যেন খুশীর আভা ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

সেদিন ঘণ্টাখানেকেরও ওপর জুবেদা জলে পড়ে রইল! আমিও চান করছি একধারে, আর, শুঁড় দিয়ে জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওর সে কী ফূর্তি!

বললাম—বাড়ী যেতে হবে না? সারাদিন পড়ে থাকবি?

'বাড়ী'র কথায় হঠাৎ শয়তানীর মুখখানা ভেসে উঠল মনের কোণে। মনে হলো, আমার জন্য ভাত বেড়ে সে হয়তো চুপচাপ

বসে আছে রান্নাঘরের দাওয়ায়; খায়নি-দায়নি—আমার প্রতীক্ষা করছে। তাড়া দিয়ে বলে উঠলাম—এ-ই জুবেদা, কি দিল্‌লাগি হচ্ছে! ওঠ্‌ বলছি—ওঠ্‌ শীগ্‌গির।

জুবেদাকে তার জায়গায় রেখে, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে, বাড়ী ফিরে এলাম যখন,—তখন দেখি, রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে ও সত্যিই শুয়ে পড়েছে। বেলা তখন হু'টোর কম নয়। রান্নাঘরের দরজা ভেজানো। আলতোভাবে দরজা খুলে দেখি, যা ভেবেছিলাম, তাই। আমার জন্য ভাত বেড়ে একটা বড়ো বেতের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। নিজেও খায়নি বোধ হয়।

বড়ো মায়া হলো। ওর কাছে ব'সে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত দিলাম। ও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো, বললে—তুই!

—আবার কে?

ও বললো—খোয়াব দেখ্‌ছিলাম। স্বপ্ন। বনের ভিতরে একটা জায়গা—পুরানো পাতাগুলো গাছ থেকে ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে যাচ্ছে, নতুন নতুন পাতা উঁকি দিচ্ছে কচি কচি বাচ্চাদের মুখের মতো।

বললাম—খোয়াব হবে কেন? জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌না প্রত্যেকটি গাছ থেকে শুক্‌নো পাতা ঝরে যাচ্ছে,—কচি পাতা জেগে উঠছে! বসন্ত এসেছে যে!

সরম পেয়ে মুখটা নীচু করলো। বললো—কতক্ষণ এসেছিস?

—এই ত!

বললে—কাপড়টা ভেজা যে? ছেড়ে এলে হতো না?

—আব্বাজান?

বললে—খাইয়ে-দাইয়ে দিয়েছি, ঘুমোচ্ছেন।

—তুই খেয়েছিস?

ঝংকার দিয়ে বলে উঠল,—হয়েছে থাক্ ! তাড়াতাড়ি আয় দেখি—কম বেলা হয়ে গেছে ?

শুরু হলো খাওয়ার পালা। বললাম—আয় না, এক থালায় খাই ?

—ভাগ !—বলে, একটা হাত তুলে চড় দেখালো।

আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না। কিছুক্ষণ পরে ও বললে—ডাকতে যাইনি ভেবেছিস ?

অবাক হয়ে বললাম—কাকে !

ও বললে—কাকে আবার ! তোকে ?

—কেন ?

ও বললে—আসতে দেরী করছিস ! ভাবনা হয় না ? গিয়ে দেখি, জলের মধ্যে জুবেদার পিঠে শুয়ে তার কানে-কানে কথা বল্‌ছিস্ !

একটু হেসে বললাম—ডাকলি না কেন ?

বললে—ইস, ডেকে রাগ কুড়োই আর কী !

—না-না, রাগ্‌বো কেন ?

ও বললে—বলা যায় না ! যে রকম ভালোবাসাবাসি— !

অল্প একটু হেসে চুপ করে রইলাম। আর কোনো কথা হলো না।

দিন এম্‌নিভাবেই কাট্‌তে লাগলো।

বাংলোয় থাকতে থাকতে ঘরের কাজে ও রীতিমত পটু হয়ে উঠেছিল। ঘরকন্নায় ও-যে বেশী চৌখস, সেটা বুঝতে আমার বেশী দেরী হলো না। বিশেষ করে সেবায়-যত্নে দীনমহম্মদ সাহেবকে ও তো একেবারে বশই করে ফেললো, বলা চলে।

শুধু আমাকে বললে একদিন,—জুবেদাকে নিয়ে সত্যিই অতো মাখামাখি কীসের ? আসলে তো ওঠা হাতী। কোন্‌দিন কী ক্ষতি ক'রে বসবে, কে জানে !

একটু হেসে উত্তর দিলাম,—মানুষ ক্ষতি করবে, কিন্তু ও কোনোদিন আমার ক্ষতি করবে না।

—ঈস্! মহব্বৎ নাকি?

বললাম্—তার চেয়েও বেশী।

মুখ কালো ক'রে বললো,—তবে আমাকে আন্লি কেন?

—আমি এনেছি?

ও বললে,—না আনলেও, তুলেছিস তো ঘরে? পেয়ার করবার জন্যেই তো এনেছিলি?

বললাম—পেয়ার কী করি না?

ঠোঁট উল্‌টে বললে,—ছাই! চব্বিশ ঘণ্টা তো ঐ 'কুম্‌কী'টাকেই নিয়ে কাটে!

বললাম,—ওটা যে চাকরী!

ও বললে,—চাকরী কি আর কোনো মাহুত করছে না? তুই তার ঢের বেশী করিস—করিস না?

হেসে ফেললাম। ওর একটা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,—হিংসে করিস না! তোকেও ভালবাসবো। প্রাণ ঢেলে ভালবাসবো। জুবেদা আর তুই,—তুই-ই আমার কলিজা।

কথাটা শুনে ফিক্ ক'রে হেসে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল শয়তানী।

এম্‌নি ক'রে দিন যায়। দীন মহম্মদ সাহেবের পায়ের ফুলোটা হল্‌দি লাগাতে লাগাতে অনেক কমে এলো, জঙ্গলের 'মূলি' বেটে লাগাতে-লাগাতে ঘা-ও অনেকটা সেরে আসছে,—কিন্তু তবুও ওঁর ভবিয়ৎ ভালো যাচ্ছে না। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না বললেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে রোজ বিকালে আসে —বোখার।

এক-একদিন বলি,—কোনো কথা শুনবো না আব্বাজান, আমি ডাগ্‌দার নিয়ে আসবো শহর থেকে।

উনি বলেন—সে যে অনেক টাকার ব্যাপার। কোথায় পাবি?

তারপরে একটু হেসে মাথার ওপর রাখেন হাতখানা, বলেন,—ভাবিস না। খোদার মর্জি হলে বেঁচেও যেতে পারি। মুন্নী আমার যে-রকম যত্ন করে, তাতে শীগ্‌গির মরছি না।

মুন্নী! মুন্নী কে?

বুঝলাম কিছুক্ষণ পরেই,—কার নাম মুন্নী। আমার ভিতরে ভিতরে দুটো ভয় ছিল। এক, জুবেদা ছাড়া পেয়ে সেই 'মস্ত' হাতীটার পিছনে গিয়ে না জোটে! কিন্তু, তা সে যেতো না। বিকেল হলেই ছাড়া পেয়ে আমার কাছে চলে আসতো, হতো আমার সেই ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গী।

আর, দ্বিতীয় ভয়টা ছিল—দীন সাহেব যাকে 'মুন্নী' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছেন, সেই শয়তানীকে। বাংলোয় লোক আসতে আরম্ভ করেছে, আমি জানি। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কাছে যেতে ও-মেয়ের পক্ষে আর কতক্ষণ?

কিন্তু, তাজ্জব কাণ্ড! সতর্ক চোখ রেখেও দেখেছি, বাংলোয় ও যায় না; ওদিকে যাবার মনও নেই ওর। আব্বাজানের সেবা আর ঘরকন্নার কাজ নিয়েই মেতে থাকে। তবু বিকেলের দিকে, জুবেদাকে যখন পাঠাতাম লাটাই আনতে,—তখন, কোনো কোনো দিন,—জুবেদার ডাক শুনে বুঝতাম,—দাওয়ার বাতায় যেখানে লাটাইটা গোঁজা থাকতো সেখানে সেটা নেই।

বুঝতাম, এ-কাজটা কার! দুষ্টুমী করে লাটাই অন্য জায়গায় যে লুকিয়ে রেখেছে, সে আর কেউ নয়,—আমার শয়তানী—বাবার মুন্নী!

ছুটে এসে বলতাম—কী দিল্‌লাগি হচ্ছে! লাটাইটা শীগ্‌গির বার করে দে!

মুখ টিপে হেসে বলতো,—বয়েসটা কত হ'লো? এখনো ছেলে-মানুষের মতো ঘুড়ি ওড়ানোর শখ?

মিনতি করে বলতাম,—লক্ষ্মীটি, শীগ্‌গির দে! এটা আমাদের

অভ্যেস। জুবেদাকে কেমন মাঠের মধ্যে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখি, দেখবি?—আয় না!

রাগ দেখিয়ে বলতো,—না বাপু, আমার অতো সময় নেই যে, হাতী নিয়ে হৈ-হৈ করবো।

বলতাম,—কী মুশকিল! হৈ-হৈ হবে কেন। আমি ঘুড়ি ওড়াবো, আর ও কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়বে না—চড়বে না,—যতক্ষণ না আমি সুতোর বাঁধা খুলে দেবো।

চোখ বড়ো-বড়ো করে শুনতো। বলতো,—সুতোর বাঁধনে কি আর কুম্‌কী থাকে?

বলতাম,—সত্যি! তুই দেখবি আয় নিজের চোখে।

ও ফিক করে হেসে ফেলতো। বলতো,—সুতোর বাঁধনে বাঁধা থাকে না,—বাঁধা থাকে অন্য এক বাঁধনে!

অবাক হয়ে বলতাম,—কীসের আবার অন্য বাঁধন?

লাটাইটা লুকানো জায়গা থেকে বার করে আমার হাতে দিয়ে চট্ করে ছুটে পালাতো একটিমাত্র কথা বলে। সে কথাটি হচ্ছে—"মহব্বতের বাঁধন!"

ও চলে গেছে সাম্‌নে থেকে, কিন্তু জুবেদা ততক্ষণে পিছন থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডেকে উঠেছে। ওর সেই ডাকের অর্থ হলো,—কী করছো তুমি? দেরী করছো কেন মিছিমিছি ঔ রঙ্‌চঙে শাড়ী-পরা মানুষটির সঙ্গে কথা বলে?

জুবেদাকে নিয়ে এরপর যথারীতি বেরিয়ে পড়তাম বটে, কিন্তু মনটা কেমন যেন ভার হয়ে থাকতো। 'মুন্নী' নাম দিয়েছিলো দীন সাহেব। কিন্তু ঠিক দীন সাহেবের দেওয়া নাম ওটা নয়। ঐ নামে ডাকতো ওর সেই বাংলোর সাহেবরা। আমার কাছে আসবার আগে থাকতেই সেটা আমি জানতাম। পাছে সেটা চল হয়ে যায় বলে আমি কখনো ডাকতাম না ঐ নামে। কিন্তু, তগ্‌দীর দেখুন

বাবুজী, আব্বাজান নিজেই চালু করে দিলেন ঐ 'মুন্নী' নাম। ওর নিজের কী-একটা জংলী নাম যেন ছিল মনে পড়ছে, অথচ সেই নাম মুছে গিয়ে সবার কাছেই ও ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়ালো,—মুন্নী। ওর নিজের বাপও ডাকতো, মুন্নী। আমাদের তল্লাটের জংলীরা পর্যন্ত দীন সাহেবের দেখাদেখি ডাকতে আরম্ভ করেছে, মুন্নী! আমার ভাল লাগতো না। কিন্তু, সেদিন, জুবেদাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ নিজের মনেই বার কয়েক ডেকে উঠলাম,—মুন্নী-মুন্নী!

নিজের ডাকা নামটা নিজের কানে যেতেই চম্‌কে উঠে তাকালাম চার দিকে।—কেউ শুনতে পায়নি তো? শুনতে পায়নি তো জুবেদা? ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, ওশোনেনি, বুঝতেও পারেনি। যেমন খুসী হয়ে শুঁড় দুলিয়ে চলে, তেমনি চল্‌ছে।

আমি ওর পিঠে চড়ে রয়েছি, এগিয়ে চলেছি জঙ্গলের দিকে। সেই চলার গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন বলে উঠতে চায়,—মুন্নী সঙ্গে এলে ভালো হ'তো।

বাবুজী, সেদিন বনের সেই ঝরা পাতার দিকে তাকাতে তাকাতে, হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে ফেললাম,—মনে মনে মুন্নীকে আমি সত্যিই পেয়ার করতে শুরু করেছি! 'শয়তানী' বলে ডাকতে আর মন চায় না,—মন বলে, মুন্নী-মুন্নী-মুন্না—

শেষ পর্যন্ত এমনও হ'লো, ওকে বেশীক্ষণ না-দেখে আর থাকতে পারতাম না। যেদিকে যখনই যাই, ফাঁক পেলেই ছুটে ছুটে বাড়ী আসি। মুন্নী অবাক হয়, বলে,—হ'লো কী তোর?

সরম লাগে বলতে, 'তোকে দেখতে আসি!'—তাই, তার বদলে বলি,—দীন সাহেব কেমন আছেন?

—ঘুমুচ্ছেন।

পরে, ও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। বললে,—সত্যিই দীন সাহেবকে ঘড়ি ঘড়ি দেখতে আসিস? না, অন্য কাউকে?

—অন্য আবার কে?

ও বলতো,—কে আবার? মুন্নী!

'ধাঃ!' বলে, লজ্জা পেয়ে আমি ছুটে পালাতাম। পিছন থেকে শুনতে পেতাম ওর খিলখিল হাসির শব্দ।

অন্য কোথায় ঘুরে বেড়াবো? বনের কোনো ধারে হয়তো কাঠ-কাটার আয়োজন চলছে। বড়ো-বড়ো যন্ত্রপাতি এসেছে, কাঠুরের দল এসে জড়ো হয়েছে। সেখানে নিয়ে যেতে হবে হাতীদের। কাটা কাঠগুলো শুঁড় দিয়ে বয়ে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে আসবে হাতীতে। তারপর, লরীর ওপরে বোঝাই করে দেবে। এ-কাজের জন্য জুবেদারও ডাক পড়েছে। ওর কাছে গিয়ে ওর পায়ের শিকল খুলছি, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, আরামে ওর চোখ ছুটি বুজে এলো। বললাম,—সতি সত্যি তুই আমাকে পেয়ার করিস, জুবেদা?

শুঁড় তুলে খুশীর একটা আওয়াজ করে জুবেদা। ওকে বনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে তখন মনে হয়,—জুবেদাকেও ছেড়ে থাকা বুঝি আমার পক্ষে সমান শক্ত! আমার 'দিল্'টা যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে! এক ভাগ মুন্নীর জন্যে, অন্য ভাগ জুবেদার জন্যে।

বেলা বারোটা নাগাদ্ জুবেদার ছুটি মেলে। ওকে নিয়ে এসে চান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে যখন ঘরে তুলে দেই, তখন আরও এক ঘণ্টা কেটে যায়। বাড়ী ফিরতেই মুন্নী ছুটে আসে, বলে—বাবার কাছে এসো।

বুকের ভিতরটা অম্নি ধ্বক্ করে ওঠে! তাড়াতাড়ি ছুটে যাই পাশের ঘরে। দেখি, রফিক-চাচা দীন মহম্মদ সাহেবের খাটিয়ার পাশে চুপচাপ বসে আছেন, আর অন্যধারে এক মৌলবী সাহেব একটা বই থেকে একটানা কী যেন প'ড়ে যাচ্ছেন সুর ক'রে।

আমাকে দেখে রফিক-চাচা দীন সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে

আমার নাম করলেন। শীর্ণ স্বরে আব্বাজান ডেকে উঠলেন—আব্বাসী!

—আব্বাজান!—বলে, ছুটে গিয়ে ওঁর বুকের কাছে বসে পড়ি। উনি বল্লেন—জুবেদাকে তোর হাতে দিয়ে গেলাম, দেখিস। মুন্নীও রইল।

—আব্বাজান!—ব'লে, দু'হাতে মুখ ঢেকে আমি কেঁদে ফেললাম। রফিক-চাচা আমাকে শান্ত করতে লাগলেন। কিন্তু, সে-ই শেষ কথা দীন মহম্মদ সাহেবের। এর অনেকক্ষণ পরে, উনি আর যখন লোক চিনতে পারছেন না, তখন আপন মনে থেমে থেমে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন,—চন্দনের গন্ধ আসছে,—না? চন্দনের গাছগুলো যেন নষ্ট করিস না। জংলীদের 'কহানী'টা বল্ না রে! সেই যে কাঠুরের কহানী?

বাবুজী, আর কী বলবো? বেলা তখন চারটে হবে, দীন মহম্মদ সাহেব চোখ বুজলেন। বনের রাজা প্রকাণ্ড গাছকে কাঠুরেরা কেটে ফেললে মনের মধ্যে যে রকম ভাবটা হয়, যে রকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগে সব-কিছু, ঠিক তেমনি হতে লাগল আমার মনটা। গাছের ঠাণ্ডা ছায়াটা ছিল, যেন হঠাৎ সরে গেল! অমন মানুষ আর হয় না বাবুজী!

ওঁর শেষ কাজের ব্যাপারে আমি চুপচাপ থাকি নি; ভালোভাবে যাতে 'কব্বর' হয়, ভালোভাবে যাতে প্রার্থনা এবং কোরাণ-সরিফ পাঠ করেন মৌলবী-মৌলানারা,—তার জন্য আমার কিছু ধারকর্জও হয়ে গিয়েছিল।

দীন মহম্মদ সাহেব চলে যাবার পর থেকে সংসারও চলতে লাগল খুব কষ্টেসৃষ্টে! 'বসন্ত্' কেটে গিয়ে তখন খরার দিন এসে গেছে। বাঁধের জল শুকিয়ে গেছে, হাতীদের নিয়ে যেতে হয় কয়েক

মাইল দূরে একটা পাহাড়ী নদীতে। আর আমাদের খাবার জল আসে বাংলোর কুঁয়ো থেকে। গাঁয়েও কুঁয়ো ছিল, কিন্তু সেদিকে পারত পক্ষে হাঁটতো না মুন্নী। হাঁটাচলা ওর বেশীই বা কই? ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকে সব সময়!

খরার পর এলো বর্ষা। ঘরের চাল দিয়ে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ে। এ-দিকটা মেরামত্ করি তো ও-দিকটা আবার ভেঙে পড়ে! যাকে বলে, শতছিদ্র। তার ওপরে অভাবের টান তো আছেই।

মুন্নী বলে,—জুবেদার খোরাকী থেকে কিছু সরাতে পারিস না?

—ছি-ছি! কী বল্‌ছিস তুই?

ও বলে,—ছি-ছি কী? সব মাহুতই তো করে!

—তা' করুক, জান্ থাকতে আমি তা' করবো না।

বর্ষায় ঘর থেকে বেরুনো শক্ত। তবু ছুটে-ছুটে জুবেদার কাছে যাই। মুন্নী রাগ করে। বলে—অতো কী দরদ, তোর,—অ্যাঁ? খিদ্‌মদ্‌গারীর জন্যে আর সব লোক আছে না? সেই গুণ্ডাটা কী করে?

চম্‌কে উঠে বললাম,—চিনিস তুই ওকে?

ও অবাক হয়ে গালে হাতখানা রেখে বলে,—ওমা! কাকে আমি চিনি না এ-তল্লাটের?

বললাম,—বেছে-বেছে গুণ্ডাটার নাম করলি কিনা, তাই বল্‌ছি। ও আমার দুশমন!

—জানি, যেতে-আসতে আমার দিকে কেমন টেরিয়ে-টেরিয়ে চায়!

মুহূর্তে যেন মাথায় রক্ত উঠে গেল। বললাম,—বটে! দাঁড়া, ওকে আমি খুন করবো!

আমার রাগ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো শয়তানী। বললে,—শুধু তাকায়, তাতেই খুন!

পশুর মতো গর্জন করে উঠি। বলি,—তাকাবেই না কেন?

ও বলে,—অবাক কাণ্ড! জওয়ানীর দিকে ফাঁক পেলে তাকাবে না মরদ?

—নিজের জরুর দিকে তাকাক! পরের জরুর দিকে কেন?

ঠোঁট উল্‌টে বললে,—জঙ্গলে ও-নিয়ম খাটে না। তুই কি শহরের মানুষ হলি নাকি?

বলেই আর দাঁড়ায় না কাছে, চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। ডেকে বলি,—মুন্নী!

ও কোনো সাড়া দেয় না। কিন্তু চলে আসে মুখ ভার করে একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে। বলে,—না আছে চাল, না আছে আটা, খাবি কি এবার—বল্?

—তা, আমি কী করবো?

ও বলে,—জুবেদার কাছে যা। কিছু চানা নিয়ে আয় ওর কাছ থেকে সরিয়ে।

—তারপর?

ও বললে—চানা বদ্‌লাবদ্‌লি করে আমি ঠিক চাল কিম্বা আটা যোগাড় করে আনবো।

—কোথা থেকে?

ও বললে—কেন, আমার বাপুর কাছ থেকে? বলে রেখেছি যে!

বলে উঠলাম—তার থেকে কিছু চাল ধার করেই আন না বাপুর কাছে চেয়েচিন্তে?

বললে—সেই ক'রে ক'রেই তো চালাচ্ছি! আর কতো চাইব? ভাগ্যিস, বাংলোর নোকরীটা পেয়ে গেছে বাপু, নইলে যা জুট্‌ছে, তা-ও জুট্‌তো না!

বললাম—দাঁড়া, তাহলে রফিক-চাচার কাছে যাই।

মুন্নী বললে—রফিক-চাচা এক হাঁড়ি আটা পাবে। আর কতো

চাইবে ? ও-লোকটারও বা কী ভাবে দিন চলে, তা'তো জানিস না ! তুই তো জুবেদা-জুবেদা করেই পাগল। ঘর সাম্‌লাতে তো আর হয় না !

রেগে বললাম—ঠিক আছে, চুরি করলে তুই খুসী হবি তো ? তা-ই যাচ্ছি।

দুম্ দাম্ পা ফেলে চলে যাই জুবেদার কাছে। গুণ্ডার কাছ থেকে এক বাল্‌তি চানা চেয়ে নিয়ে এসে জুবেদাকে খাওয়াতে বসি। জানি আর সব মানুষের রীতি-নীতি। মুন্নী মিথ্যে বলেনি। কিন্তু, ভুখা 'জুবেদার' কাছ থেকে কেমন করে কেড়ে আনবো ওর মুখের গ্রাস ?

বাল্‌তিটা ওর সামনে ধ'রে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ছুটে যাই অন্যদিকে। অবাক হয়ে শুঁড় তুলে আমাকে ডাকে জুবেদা। আর সেই ডাক যেন আমার বুকে-পিঠে ছপ্‌টির ঘা মারতে থাকে !

মাথার ওপর দিয়ে কী-একটা পাখী যেন করুণ স্বরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলে যায়। আমি ঘরে না গিয়ে বনের এক প্রান্তে চলে যাই, যেখান দীন মহম্মদ সাহেবের কবরের ওপর সাদা-সাদা বুনো ফুলগুলি একে একে পাপ্‌ড়ি ঝরিয়ে ফেলতে থাকে !

বাড়ী ফিরি অনেক বেলায়। মুন্নী মুখ ভার করে বলে,—কোথায় ছিলি ? এম্‌নি করলে আমি যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো কিন্তু।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যায় না। উপরন্তু, ভাতের থালা ঠিক বেড়ে দেয় সামনে।

অবাক হয়ে বলি,—কোথায় পেলি !

—ধার।

—কার কাছ থেকে ?

—বাপুর।

আর কোনো কথা হয় না। এম্‌নি করেই দিন যায়। বছর ঘুরে আসে—আসে বসন্ত্-কাল। মুন্নী এই একটি বছর আমার ঘর করলো লক্ষ্মীর মতো। কিন্তু, তারপরে কী যে হলো ওর মনের মধ্যে, লুকিয়ে-চুরিয়ে ঠিক বাংলোয় যেতে আরম্ভ করলো।

খেদার সময় এসে গেছে। শিকারীরাও এসে হাজির হয়েছে ডাকবাংলোয়। ফলে, সংসারের সুরাহা কিছুটা হলো অবশ্য,—কিন্তু, আমার পক্ষে এটা সহ্য করা কেমন করে সম্ভব হবে? ওর শিরায়-উপশিরায় যেমন দুর্দান্ত জংলী, রক্ত বইছে, তেম্‌নি আমিও জবরদস্ত্ মাহুত-সর্দার দীনমহম্মদ সাহেবের সাক্‌রেদ।

একদিন জঙ্গল থেকে অসময়ে ফিরলাম ইচ্ছে ক'রে। দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়,—ও ঘরে নেই। বাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। একটা সাপ ঝরা পাতার ওপর দিয়ে সর্‌সর্ করতে-করতে জঙ্গলের দিকে গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল। কাছেই কোথায় যেন কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী ঠক্‌ঠক্ ক'রে গাছের গুঁড়িতে কোটর তৈরী করছে। কাঠবেরালী গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসে পুচ্ছ ফুলিয়ে খেলা করলো, তারপরে কী-ভেবে হঠাৎ তর্ তর্ ক'রে উঠে গেল গাছের ওপর।

এই সব লক্ষ্য করতে করতে বাংলোর দিকে আবার চোখ ফিরিয়েছি, দেখি—শায়তানী আসছে। ওর বাপের ঘর থেকে, নয়, বড়ো বাংলো-বাড়ীটার একখানা ঘর থেকে।

আমি জানি, সেইঘরে রয়েছে এক শিকারী সাহেব। ধব্‌ধবে সুন্দর চেহারা—এসেছে শহর থেকে।

আমি করলাম কী, ওঁর পিছনে-পিছনে একটু দূর পর্যন্ত এসে খপ্ করে চেপে ধরলাম ওর হাতখানা। বললাম,—শয়তানী, দিনে-দুপুরেই তুই শয়তানী শুরু করেছিস!

একটু চম্‌কে তারপর অবাক হয়েই তাকালো আমার দিকে। বললো,—হাত ছেড়ে দাও।

বলে উঠলাম—কেন, হাত ছাড়বো কেন? হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবো ঘরের মধ্যে। তারপরে বোঝাবো, কেমন করে মাথা থেকে ভূত ছাড়িয়ে দিতে হয়!

জংলী মেয়ের গায়েও জোর কম নয়, এক ঝট্‌কায় হঠাৎ হাতখানা ছাড়িয়ে নিলো। তারপরে বুকের কাছে জামার ভিতর থেকে বার করলো কয়েকটা নোট্। বললে,—এই ছাখ্, রোজগার করতেই গিয়েছিলাম।

—তা' বলে, এই ভাবে রোজগার! ছিঃ!

অবাক হ'য়ে চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে বললো,—ওমা, তাতে হয়েছে কী!

তারপরই আমাকে নির্বল-নিশ্চল লক্ষ্য ক'রে, হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেললো। বললে,—দুটো-চারটে পুরুষের মুণ্ডু না ঘুরিয়ে দিলাম তো, কী করে বুঝবো যে এখনও জওয়ানী আছি?

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম,—তাই যদি তোর মনে-মনে ছিল, তো আমার ঘর করতে এলি কেন? না এলেই তো পারতিস। আমার আব্বাজান তোর বাপুকে টাকা দিয়েছিল ব'লে? কিন্তু, তার তবে কোনো লেখা-জোখা নেই। তাই, এই আজ তোকে বলছি, সব কাটান-ছেঁড়ান হয়ে গেল,—তুই যেমন ছিলি, তেমনি আগের মতো বাংলোয় ওঠ্ গিয়ে,—আমার কাছে থাকবার আর দরকার নেই!

বাবুজী, আমি ভেবেছিলাম, শয়তানী আমার কথায় খুশী হয়ে উঠবে। বলবে,—তাহলে, আমি বাংলোতে চলে চাই?

লোকিন, তা হলো না। ও আমার আরো কাছে সরে এলো। চোখ দুটো যেন বনবিড়ালের চোখের মতো জ্বলে উঠলো। বললে,—তোমার কাছে এসেছিলাম বুঝি শুধু টাকার জন্য? টাকা রোজগারের

তাগদ্ বুঝি আমার ছিল না? তাই বাপু টাকা নেওয়াতে সুড় সুড় করে বুঝি উঠেছিলাম তোমার ঘরে এসে। কেন? না আমার আর অন্য রাস্তা নেই, তাই টাকার বাঁদীগিরি করবার জন্য তোমার কাছে চলে এলাম, তাই না?

বলতে-বলতে পাগলের মতো প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল মুন্নি। বলেছিল,—ভুল—ভুল—সব তোমার ভুল! আমি এসেছিলাম অন্য কারণে।

—কা কারণ?

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বাংলোর পিছনের দিক। এক দিকে দেওয়াল, অন্যদিকে মাঠ। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই ও হঠাৎ করল কী, ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লো আমার বুকের ওপর। আশ্চর্য, কান্নাভরা গলায় বললে,—কী কারণ শুনবে? তোমাকে পেয়ার করতাম ব'লে!

—ছাই তোর পেয়ার!—ব'লে, দু'হাত দিয়ে জোর করে সারিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। বলে উঠেছিলাম,—বাজে কথা বলিস কেন? পেয়ার থাকলে, যা তুই করছিস, তা' কি তুই কখনো করতে পারতিস?

সরম পাওয়া তো দূরের কথা, শয়তানী উল্‌টে বললে,—এ-যে তুই শহুরেদের মতো কথা বল্‌ছিস!

আর, তারপরেই অবাক হবার ভঙ্গীতে গালে হাত রেখে বলতে লাগলো,—তুই যা বললি, তা কেউ পারে না? তোর কুম্‌কী'রা কী করে? বুনো হাতী টেনে আনে,—কিন্তু, তা'বলে বুনো হাতীকে কী পেয়ার করে?

—তুই কি কুম্‌কী?

এবারেও সরম পেলো না কথাটায়। শুধু ওর জ্বালাধরা চোখ দুটে ছলছল ক'রে এলো। বললে,—না, 'কুম্‌কী' নই, আমি মানুষই বটে।

—তবে ?

—কী তবে ? ও তেমনি কান্নাভেজা গলায় বলতে লাগলো,—আমি মানুষ। আমি আওরৎ। আমি জওয়ানী। জানিস তুই আমার সব কথা ? এই যে একটা বছর তোর ঘর করলাম, কখনো শুনতে চেয়েছিলি আমার কথা ? এই আমি কি এ-রকম ছিলাম নাকি ? আমাকে কী করেছিল জানিস ? আমাকে মিছিমিছি 'ডাইনী' বলে সমাজের লোকেরা ঢিল মেরে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাপু মেয়েকে ভুলতে পারেনি ব'লে চলে এসেছিল পিছনে-পিছনে। তখন এই বাংলোর একটি সাহেবই আমাকে জায়গা দিয়েছিল। হিন্দী জবান্ শিখিয়েছিল।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—কাকে বল্‌ছিস ! সে সব খবর সত্যি সত্যিই আমি জানি না ভাবিস ?

মুন্নি বললে—কোত্থেকে জান্‌লি ?

বললাম—জানলাম একরকম ক'রে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেললো মুন্নী। আমার কাছে অদ্ভুত লাগলো কিন্তু ওর হাসি। এই রাগ, এই কান্না, এই হাসি —এমন তাড়াতাড়ি করে ভাব বদল করতে একমাত্র মেয়েরাই বুঝি পারে ! ও বললো—মহব্বতের এই রীত্। দূর থেকে আমার সব কথা শুন্‌তিস তুই, আমার সব খবর রাখতিস। সাচ্ না ?

মুখ নীচু করে চুপচাপ রইলাম। আমি যে কথাটায় একটু লজ্জা পেয়েছি, ও কিন্তু ঠিক তা' বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পেরে আবার হেসে উঠলো খিলখিল করে। বললে,—কী আন্দাজ তোর ! সাহেবটার সঙ্গে আমার পেয়ার হয়েছিল ?

তখনো চুপ করে আছি লক্ষ্য ক'রে অনেকটা আপন মনেই বলতে লাগলো মুন্নী—সাহেবটা ছিল আমার বাপের বয়সী। সারাদিন বসে-বসে কাজ করত, কখনো-কখনো দলবল নিয়ে বাইরে যেতো, বনের

মধ্যে। কতো কিশিমের কতো লোকই না আসতো সাহেবটার কাছে দরবার করতে। আবার, তক্‌রারও হতো আদ্‌মীদের সঙ্গে। ওদের কথায় মাতিয়ে দিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ভিতরের ঘরে চলে আসতো সাহেব। বলতো,—ইন্‌সান কালে বলে? আদমী কাকে বলে?

আমাকে কথা মুখস্থ করাতো। লিখতে-পড়তে কিন্তু শেখায় নি। শিখিয়েছিল শুধু কথা বলতে। বলতো—ঘর ছেড়ে বেরুবি না। বাইরে বেরুলে ওরা সব তোকে ছেঁকে ধরবে।

অবাক হয়ে বলতাম,—কারা?

বলতো,—জানোয়াররা,।

একদিন বললে—মহব্বৎ মানে কি বল্‌তো? পেয়ার?

মানে যেদিন বুঝলাম, সেদিন ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে লাগলাম। বললে,—পেয়ার করিস আমাকে?

বাপের বয়সী সাহেবটা দিনে-দিনে আমাকে অবাক করে দিতে লাগলো। ঘরের মধ্যে আট্‌কে রাখে, লোকজন এলে বাইরে থেকে ছেকল তুলে দেয় পর্যন্ত, কিন্তু কখনো জোর-জবরদস্তি করে না। আমার বাপু বলে—আমাকে টাকা দিয়েছে, ওর কথাশুনে চলিস, ওকে রাগিয়ে দিস না।

তা' রাগিয়ে আমি দিতাম না ঠিক। কিন্তু সাহের রাত্রে গ্লাসে ওসুধ ঢেলে খেতো—আর আমার পায়ের কাছে বসে কাঁদতো, পায়ে হাত দিতো আমার, পায়ে মাথা রাখতো। আমি অতোশতো তখন বুঝতাম না, অবাক হয়ে লোকটাকে শুধু দেখতাম। বোতল থেকে ঢেলে যা খেতো, তা' যে কী জিনিস, এখন তা' বুঝি, তখন বুঝতাম না। তখন এটুকু বুঝতাম,—সাহেবটা বড়ো জবরদস্ত সাহেব, ভারী অফ্‌সর, লোকেরা কাঠ-কাটবার ব্যবসা করছে বলে ওর কাছে এসে কতো খোসামোদ করে।

কিন্তু, সেই অফ্‌সর-লোক আমার পায়ে হাত দেয় কেন, আমি অবাক হয়ে তা-ই শুধু ভাবতাম। আমি তত দিনে জওয়ানী হয়েছি। বলতাম,—আমার বাপুকে টাকা দিয়েছিস্‌, আমাকে দিয়ে যা' করাতে চাস, কর্‌না? ব'সে ব'সে ঘুম পেতো, আর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠতাম। কিন্তু মুখে তা' বলার উপায় নেই, বড়ো অফসর-লোক, দিনের বেলা বাপের মতো যত্ন করে 'জবান্‌' শেখায়। আর রাত্রে, কাঁদে। বলে—বয়স হলো, নোক্‌রী খতম হয়ে আসচে, জঙ্গলে আর আসবো না। এতো সেবা করিস, এতো কথা শুনিস, এতো ভয়ও করিস,—একটু পেয়ার করতে পারিস না?

অবাক হয়ে বলতাম,—সাহেব, তোকে তো সবাই পেয়ার করে।

—কেউ না! সাহেব আবার গেলাসে চুমুক দিতো; বলতো,—জরু আছে দেশে, সে-ও পেয়ার করে না। বড়ো অফসর আমি, সবাই খাতির করে। বনের কাঠ চুরি ক'রে কেটে নেবে বলে ঘুষ নিয়ে আসে, খোসামদ করে, বোতল নিয়ে এসে ভেট্‌ দেয়, কিন্তু পেয়ার করে না। একটু পেয়ার—এটু পেয়ার দিতে পারিস তুই?

আরও আবাক হয়ে যেতাম কথাটায়। পেয়ার যে ইচ্ছে করলেই দেওয়া যায় না, এ-কথাটা কি লোকটা বোঝে না? ও-কি জোর করে নেবার জিনিস? না, ভিখ্‌ মেঙে পাবার জিনিস? ছ'মাহিনার ওপর ছিল লোকটা, তারপর চলে গেল, আবার এলো ছ'মাহিনা পরে; কিছুদিন থেকে আবার চলে গেল। আর সেই যে চলে গেল, আর এলো না। শেষবার আমাকে বলেছিল,—তুই আমার সঙ্গে যাবি মুন্নী?

বলেছিলাম—কোথায়?

সাহেব বলেছিল—দেশে। তোকে আলাদা বাসায়—আলাদা ঘরে রাখবো।

মনটা আপনা আপনি কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়েছিল। যাই নি।

এতো খোসামোদ করল, তবুও না। লোকটা আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে কতই না কাঁদতে লাগলো। পায়ের ওপর হাত বুলোতে লাগলো। যতো ঐরকম করে লোকটা, ততো আমার রাগ বেড়ে যায় ভিতরে ভিতরে। সেই যে একবার 'না' বললাম,—আর তা' 'হ্যাঁ' হলো না। সাহেব চলে গেল, আমাকে নিয়ে যেতে পারলো না। বাপু আরও টাকা পেয়েছিল। পেয়ে, আমাকে ধমকে উঠে কতবার বললে—যা না?

আমি বাপুর মুখের ওপর চোখ গরম করে বলেছিলাম—তুই যা না।

বাপু আমার ভাবভঙ্গী দেখে একটু নরম হয়েছিল। বলেছিল,—তোকে চাইছে যে।

বলে উঠেছিলাম—আমাকে চাইছে আমি বুঝবো, তুই কথা বলার কে?

বাপু বললে—টাকা নিয়েছি না?

মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল, বলেছিলাম—সরম নেই তোর? মেয়ের ইজ্জত বে'চছিস টাকা নিয়ে?

বাপু অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার কথায়। যেন 'ইজ্জত' কথাটা জীবনে সে প্রথম শুনছে! 'ইজ্জত' বলে যে একটা কিছু আছে, তার সঙ্গে বাপুর পরিচয় হয়েছিল যেন সেই প্রথম! কিম্বা বলা যায়, 'ইজ্জত' বলে কোন বস্তু যে থাকতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করে না।

মুন্নী বলতে লাগলো,—তোকে আর কী বলব! কতো সাহেবই তো তারপরে এসেছিল বাংলোয়, কিন্তু কখনো কাউকে 'পেয়ার' করেছি? ওরা যা-ই কেন বলুক না আমাকে, যা-ই কেন করুক না আমার সঙ্গে—আমি যে দিন থেকে তোকে দেখেছি, সেদিন থেকে তোকে মনে মনে পেয়ার করতে আরম্ভ করেছি।—না-না, 'তোকে'

নয়—'তোমাকে'। ছোটলোক হলেও ছোটলোকের মত 'তুই-তকারী' করব না তোমার সঙ্গে।

বলতে বলতে মুন্নী একটু সরম পেলো কথাটায়। সরমের সঙ্গেই একটু হাসলো, তারপরে বললে,—এ-ও আমাকে সাহেব শিখিয়েছিল। সে সাহেব খুব কেতাব পড়তো। বড়ো বড়ো 'চুট্টা' খেতো, যাকে বলে 'চুরুট'! বলতো—যাকে পেয়ার করিস, তার সঙ্গে 'তুই তোকারী' করে কথা বলিস কেন?

মুন্নী বললে,—তারপর থেকে সাহেবের সঙ্গে 'তুমি' করেই কথা বলতাম, আর সাহেব ভাবতো, আমি তাকে খুব পেয়ার করছি। সব সাহেবরা পেয়ারের কাঙাল। শহরে ওরা কি পেয়ার পায় না?

মুন্নী আমাকে সেদিন বলেছিল,—দেখ, পেয়ার এক কথা, রং-ঢঙ্ আরেক কথা। এই রং-ঢঙ্‌কে তুমি গালি দিতে পারো। কিন্তু আমি সমাজ-ছাড়া জওয়ানী, আমি রং-ঢঙ্ ছাড়বো কেন? বিশেষ করে, ওতে যখন রোজগার করা যায়?

বলতে বলতে আবার হাসতে লাগলো মুখ টিপে-টিপে,—তারপর আমার একখানা হাত টেনে নিলো হাতের মধ্যে। গলার স্বর নরম করে বললে—ঘরে এসো। আর রাগ করতে হবে না।

হস্তিনী যেমন হাতীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পিছনে-পিছনে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি করে ও-আমাকে টেনে নিয়ে চললো আমার কুঁড়ে-ঘরের মধ্যে।

বাবুজী, ক্রমে-ক্রমে মনটা আমার স্থির হয়ে এলো। ভাবলাম যা করে করুক, আমার অতো ভাববার দরকার কী? আর তাছাড়া, কাকে বোঝাবো সমাজের নিয়ম-কানুন?

সেই জঙ্গলের মধ্যে সমাজই বা কোথায়, সমাজের বাধাই বা কোথায়! কতো লোকই তো কতো ভাবে থাকছে, সেখানে গিয়ে কে তাদের শাসন করছে?

আপনাকে বলবো কী বাবুজী, জঙ্গলের মায়া বড় ভয়ানক। জঙ্গলে দিনের পরদিন থাকতে থাকতে মানুষের মনও হয়ে যায় জংলীর মতো। কোনো বাঁধন না-মানার একটা দুরন্ত নেশা যেমন মানুষকে সেখানে পেয়ে বসে মাঝে মাঝে। জঙ্গলের ঝাউ আর দেওদার বনের গায়ে-লাগা ঝির্‌ঝিরে বাতাস যেন শরাবের মতো,—মানুষকে নেশা ধরিয়ে দেয়।

আমাদের মুন্নী ছিল খাঁটি জঙ্গলের মেয়ে। জঙ্গলে থাকে বলে শুধু নয়, জঙ্গলের স্বভাব নিয়েই ও-জন্মেছে। তার ওপরে, খুব ভালো তন্দুরস্তি। সারা শরীর বেয়ে যেন শরাব ঝরে পড়ছে!

জুবেদা যেমন ছিল সেরা কুম্‌কী, মুন্নীও ছিল ও-জঙ্গলের সেরা মেয়ে। ওর ভরা যৌবন যেন শরীরের পেয়ালায় দামী মদের মতো টলটল করছে। সত্যি কথা বলতে কী,—আমরা যারা জঙ্গলে থেকে জঙ্গলের মানুষ হয়ে গেছি, আমাদেরই মাথা ঘুরে যায় ওর দিকে তাকিয়ে,—তার ওপর বাইরে থেকে আসা শহুরে মানুষ বাংলোর সাহেবদের পক্ষে সত্যিই শক্ত ওর রঙ্‌-ঢঙের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া!

দিনের পর দিন যায় এ-ভাবে। গুণ্ডার কথাতো আপনাকে আগেই বলেছি বাবুজী, সেই যে, সে বলেছিল, 'খুনের বদ্‌লা খুন নেবো।' সেই গুণ্ডা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে, বলে —কী হ'লোরে তোর জরুর?

চুপ ক'রে থাকি। ও হাসে, আর আমার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে-দিয়ে উঠ্‌তে থাকে। গুণ্ডা তার নিজের ভাষায় গ্রাম্য একটা ছড়া কাট্‌তে থাকে, যার ভাবটা হলো—"পরের ঘরে নিজের নারী, সে পুরুষের গলায় দড়ি!"

সহ্য করতে পারি না, ছুটে চলে যাই বনের ধারে। দীনসাহেবের কবরের কাছে গিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকি। দূর থেকে একসময়

জুবেদার ডাক শুনতে পাই, তবু সাড়া দেই না। সাহেবের কবরের ওপর মাথা রেখে কেঁদে ফেলি। বলি,—এ-তুমি আমার কী ক'রে গেলে, আব্বাজান ?

দম্‌কা একটা হাওয়া এসে ফুল ঝরিয়ে দিয়ে যায়। যেন বলে যায়,—সহ্য কর-সহ্য কর—ফুলের ঝরবার কাল আসবে, ফুল তখন তোর পায়ের ওপরেই এসে ঝরে পড়বে।

হঠাৎ এক সময় ঝরা পাতার ওপরে কার চলাফেরা করবার সর্‌সর্‌ শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে উঠে মুখ তুলি। মনে হয়, চিতা নয় তো !

না, চিতা নয়, ডোরা-কাটা হল্‌দে শাড়ী-পরা, খোঁপায় একরাশ হলুদ রঙের বুনো ফুল,—কাছে এসে দাঁড়ায় মুন্নী। কয়েক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে,—বিকেল গড়িয়ে গেল, ঘুড়ি ওড়াতে গেলি না যে ? জুবেদা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সাড়া দিলাম না। ও করলো কী,—হঠাৎ এসে ঝুপ্‌ করে বসে পড়লো আমার পায়ের কাছে, আমার বাঁ-হাঁটুর ওপরে আল্‌গোছে ওর হাতখানা রেখে ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগলো,—আমার 'দিল' তোমাকেই চায়, আমি তোমাকেই 'পেয়ার' করি,—এটা বোঝো না কেন ?

উত্তরে কী-যেন বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু গলায় স্বর ফুট্‌লো না। ভিতরে একটা অন্ধ আবেগ গুম্‌রে গুম্‌রে মরতে লাগলো শুধু। যেমন রোজ হয়, তেমনি আমার হাত ধ'রে ধীরে ধীরে ঘরে নিয়ে গেল। সরমের কথা বাবুজী, আমি তখন বদ্‌লে গিয়েছেলাম খোলাখুলি ওকে পারতাম না। ঐ যে হাত ধরে আমাকে ঘরে নিয়ে এলো, ঐ যে কিছু বলতে একটু 'মিঠি-মিঠি' বাত্‌ করলো, ওতেই মনে হলো, আমার মনের সব আগুন নিভে গেছে। আবার আমার মুখে হাসি

ফুটলো, আবার আমি ছুটলাম আমার জুবেদার কাছে। জুবেদার গলা জড়িয়ে ধ'রে খুব আদর করলাম।

গুণ্ডা চানার দুটো বালতি দু'হাতে ধরে এদিকেই আসছিল, ঠক্ ক'রে বালতি দুটো মেঝের ওপর রেখে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে লাগলো। বললে—কুম্কী নিয়েই থাক্, জওয়ানী আওরৎ তোকে কলা দেখিয়েছে। দেখ্ গিয়ে এতক্ষণে সাজগোছ ক'রে বাংলোর দিকে পা বাড়িয়েছে!

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগল সারা শরীর, কয়েক পা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে, রুদ্ধ-উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলাম,—বেশ করেছে, তাতে তোর কী?

—আমার কী!—গুণ্ডার চোখ দুটোতে যেন আগুন জ্বলে উঠলো, লম্বা শক্ত হাত দুটোর পেশী যেন দ্বিগুণ ফুলে উঠলো, সে বললে—তোকে দু'পায়ে থেঁৎলেছে মানে, সব মরদদের ও দু'পায়ে থেঁৎলেছে! কেন, আমরা জঙ্গলে থাকি, আমরা গরীব,—তা'বলে কি মানুষ নই? যদি তুই সত্যিকারের মরদ হোস্ তো ওর চুলের মুঠি ধরে ঘরে টেনে নিয়ে আয়! যদি সত্যিকারের মরদ হোস্ তো, হাতে লাঠি নে, ওকে শাসন কর। বুঝলি হাঁদারাম, পেয়ারে আওরৎ বশ হয় না,—আওরৎ বশ হয় লাঠিতে!

আপনাকে এর পরের কথাটা আর কী বলবো বাবুজী, মুখে উচ্চারণ করতেও সরম লাগে। আমার ভিতরকার যে সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল, সে যেন হঠাৎ ফোঁস ক'রে ফণা তুললো! আমার ভিতরে যে বারুদ জমা হ'য়ে ছিল—তাতে যেন মুহূর্তে আগুন ধ'রে গেল! কী করছি—কী না করছি, তার কিছুই ঠিক ছিল না,—পাগলের মতো ছুটে গেলাম ঘরে। সাম হয়ে গেছে, ঘরে কুপিটা জ্বালিয়ে, সেই আলোয় মুন্নী তার পরণের শাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরছে। কপালে কাঁচপোকার টিপ পরেছে, মুখে শহর থেকে আনা পাউডারের ছোপ

লাগিয়েছে। আমাকে অমন করে শুট্ করে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমে ভয়ানক চম্‌কে গিয়েছিল। ঘাঘ্‌রার ওপরে শাড়ীর একটা ঘের দিয়েছিল মাত্র, বাকী আঁচলটা বুকের কাছে দু'হাতে জড়ো ক'রে কয়েক পা পিছিয়ে গেল অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে, তারপরে একটু দম নিয়ে বলে উঠলো—তুমি!

বললাম—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ এখন?

অবাক হয়ে গেল আমার কথায়। তারপরে বললে—জানোই তো কোথায়।

বলালম—না, তুই যেতে পারবি না!

ও আমার দিকে পিছন ফিরে শাড়ীটা ঠিক-ঠাক করতে লাগলো।

রাগে আমার তখন কোনো জ্ঞান ছিল না, ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলাম—এ-সব তোকে ছাড়তে হবে।

মুখখানা ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে, বললে—খাবি কী!

বলে উঠলাম—সে-সব আমি বুঝবো। তোর যাওয়া হবে না!

ও বললে—পাগল নাকি! আর তা হয় না। আমি যাবোই!

দরজার কপাটের আড়ালে ছোট একটা বেতের লাঠি থাকতো সব সময়। দীনসাহের লাঠি, ওঁর মৃত্যুর পর থেকে লাঠিটা এ-ঘরেই থাকে।

আমি চট্ করে সরে গিয়ে লাঠিটা বার করে আনলাম। তারপরে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম,—যা দেখি, কেমন করে যাবি তুই? আজ ইসপার নয় ওস্‌পার—একটা কিছু হয়ে যাক!

ওর জামার বোতাম তখনো সবগুলো লাগানো হয়নি। আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে ও জামার বোতামই ঠিক করছিল, আমার অমন মূর্তি দেখে হয়তো-বা একটু ভয় পেলো। কিন্তু সে-তো এক মুহূর্তের জন্য। চোখে যে মায়া-দৃষ্টি ফুটিয়ে ও আমাকে লহমায় শান্ত ক'রে দেয়—নির্জীব ক'রে দেয়,—সেই অদ্ভুত দৃষ্টি চোখের কোণে ঢেউ

খেলিয়ে ও মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বলে উঠলো—ছিঃ! পাগলামী করিস না! বড়ো রহিস্ আদমী এসেছে বাংলোয়।

আগেই বলেছিলাম আপনাকে বাবুজী, আমার সেদিন 'দিমাগ্' খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর একটি কথাও না বলে সেই লাঠি-গাছটা দিয়ে ওকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলাম। এমন মেয়ে, তখন যদি চীৎকার ক'রে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে কেউ ছুটে আসে, আমাকে ধ'রে সরিয়ে দেয়, আর ও-ও বেঁচে যায়! লেকিন্, তাজ্জবের কথা বাবুজী, প'ড়ে প'ড়ে মার খেলো, দাঁত দিয়ে আচল চেপে রইলো, তবু 'টু' শব্দটি করলো না। দুটি হাত দিয়ে প্রথম-প্রথম বাধা দেবার চেষ্টা করলো, পরে তা-ও করলো না। হঠাৎ এক সময় কপালে হাত দিয়ে কপালের একটা পাশ চেপে ধ'রে লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে।

আমার হাতের লাঠি ততক্ষণে থেমে গেছে। উত্তেজনায় থর্থর্ করে কাঁপছে সমস্ত শরীর। 'মাথার খুন চাপা' বলে একটা জিনিস আছে না? আমার তা-ই হয়েছিল। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ঘ'ষে বলে উঠলাম,—হারামজাদী! আমার দিকে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো মুন্নী, আর সেই মুখখানার দিকে তাকিয়ে আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন! দুটি চোখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক বেদনার ছায়া! ঠোঁট দুটি কাঁপছে, মাথার চুল এলোমেলো, আর, কপালের যেখানটা ও টিপে ধরেছে, সেখান থেকে হাতের আঙ্গুল ছাপিয়ে ঝ'রে পড়ছে রক্তের-ধারা। আঙুল থেকে ধারা নেমেছে হাতের ওপর, সেখান থেকে বাহুমূলে, বাহুমূল থেকে টপ টপ করে ঘরের মেঝের ওপরে!

বাবুজী, আপনাকে বলবো কী, আমি যেন দেখতে দেখতে হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে গেলাম! কোথায় গেল আমার রাগ, কোথায় গেল আমার অভিমান! আমার ভিতরটা যেন 'হায় হায়' ক'রে উঠ্লো।

আর তারপরে, অদৃশ্য কোন্ শক্তি যেন আমাকে ঠেলে ফেলে দিলো ওর কাছে, অদৃশ্য কোন্ শক্তি যেন আমার তুটি হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো, অদৃশ্য কোন্ শক্তি যেন আমার তুটি চোখে হঠাৎ জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে চোখের পাতাটি ভিজিয়ে দিলো। রুদ্ধকণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠলাম,—মুন্নি!—মুন্নি! আমার—মুনিয়া! সেই ভাবেই নিজেকে ও এলিয়ে দিলো আমার বুকের ওপরে। রক্তে আর চোখের জলে আমার বুকের কাছটা ভিজে উঠ্‌লো। পাগলের প্রলাপের মতো বারবার আমি বলতে লাগলাম,—কী করলাম আমি—এ কী করলাম!

অতি কষ্টে ও যেন কথা বললো এবার। বললে—একটু জল এনে দেবে?

ধীরে ধীরে ওকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিলাম,—যেমন করে ছোট ছেলেরা যত্ন ক'রে তাদের পুতুলগুলোকে শুইয়ে রাখে। তারপর ছুটে গেলাম রান্নাঘরে। জল নয়, খুঁজে পেতে কিছু ফরসা কাপড়ের ফালি নিয়ে এলাম। ওর কাছে রেখে, ওর মাথাটা টেনে নিলাম কোলের ওপরে। বললাম—কতোটা লেগেছে দেখি?

ধীরে ধীরে উঠে বসলো, বললে,—জঙ্গলে যাবে? সেই লতা-পাতা খুঁজে নিয়ে এসো, আব্বাজানের জন্য যা তোমরা আনতে।

বলাবাহুল্য, একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। জঙ্গলের এক প্রান্তে—আব্বাজানের কবরের কাছেই পেলাম সেই বিশেষ লতাপাতা। লণ্ঠনের অলোয়, যতদূর দেখা যায়, লক্ষ্য করে দেখি আব্বাজানের কবরটা আগাগোড়া যেন ঢেকে গেছে সাদা-সাদা ফুলে,—যেন খুশীর বন্যায় ঝিলমিল করে উঠেছে আব্বাজানের কবর!

বারেবারে চোখের কোণ ভিজে ওঠে। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে লতা-পাতা নিয়ে ছুটে এলাম ঘরের ভিতরে! ও ততক্ষণে উঠে বসেছে কোনোরকমে। জলের ছিটে দিয়ে ধুয়ে ফেলেছে কপালের

রক্তটা। আমার সাড়া পেয়ে মুখটা একটু ফেরালো, বললে,—বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

—কেন?

ও বললে,—দাও না! কেউ যদি দেখে ফেলে?

এগিয়ে গিয়ে দরজাটায় খিল তুলে দিলাম। তারপরে ফিরে এসে লতা-পাতার খানিকটা নিয়ে জলে ধুয়ে থেঁতো ক'রে লাগিয়ে দিলাম ওর কপালে। তারপর কাপড়ের ফালিখানি দিয়ে একটা পট্টি বেঁধে দিলাম ওর কপালে। রক্ত বন্ধ হলো বটে, কিন্তু ওর কাপড়, আমার কাপড়—রক্তে একেবারে মাখামাখি!

ব'ললে—কাপড়টা ছেড়ে ফেলো।

বলতে-বলতে নিজেও উঠে দাঁড়ালো, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কোনোক্রমে হেঁটে ঘরের কোণে গিয়ে কাপড় বদ্‌লাতে লাগলো। আমার মনের ভিতরটা তখন যে কীরকম করছিল, সে আর আমি কী বলবো বাবুজী! একবার মনে হচ্ছিল, আমি কি কশাই! আরেকবার মনে হচ্ছিল, সহরের কানুন আর জঙ্গলের কানুন কী এক? থাক না ও সাহেবদের কাছে, তাতে আমার ক্ষতি হচ্ছে কতটুকু? 'গুণ্ডা' লোকটা যে কেমন, তা' আর আমার থেকে বেশী জানে কে? সেই আমি ওর কথায় হঠাৎ অমন 'বাউরা' হয়ে গেলাম কেন? ও-ই বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার ভিতরকার সাপটাকে অমন জাগিয়ে তুললো কেন? কী ওর লাভ?

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে এক সময় মুখ ফেরালাম আবার ওর দিকে। ও একটা সাধারণ রচ-চটা শাড়ী প'রে তেমনি কষ্টে-সৃষ্টে এগিয়ে আসছে। এসে, ঘটির জলটা মেঝের ওপর ঢেলে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগলো মেঝের ওপর থেকে। ব'সে-বসে পাথরের মতো ওর কাজ আমি দেখলাম খানিকক্ষণ। ক্লান্ত-নির্জীবের মতো একটু পরেই ও এলিয়ে পড়লো। পড়তেই, ছুটে গিয়ে

দু'হাতে ধ'রলাম ওকে। তারপরে শুইয়ে দিলাম এনে একটা মাদুরের ওপর,—মেঝের অন্য ধারটায়। বালিস নিয়ে এসে পেতে দিলাম ওর মাথার নীচে। একটু বোধ হয় আরাম বোধ ক'রল, চোখ দুটি বন্ধ ক'রে আমার দিকেই পাশ ফিরে শুলো। ওর বাহুর ওপর আলুগোছে হাতটা রেখে বলে উঠলাম,—কষ্ট হচ্ছে ?

আমার গলার স্বর ওর মনের কোন্ কোমল পর্দায় কাঁপন তুলল কে জানে, দেখতে দেখতে বন্ধ চোখের পাতা দুটি ওর জলে ভরে উঠলো। মাথা নেড়ে জানালো—না।

কিন্তু, চোখের জল কোনো বাধা মান্‌ল না। নিজেই হাত দিয়ে তা মুছতে মুছতে মুখখানা মেঝের ওপর নীচু করে ফেললো। আরও নিবিড়ভাবে ওকে ধ'রে বলে উঠলাম,—আমায় মাফ করো, আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমি বাউরা হয়ে গিয়েছিলাম।

মুন্নী মুখ তুলল, চোখের পাতাদু'টি খুলল, আবার বুজিয়ে ফেলল পরক্ষণেই। ঐ যে কথায় বলে না 'দুঃখে বুক ফেটে যাওয়া'—ওর দুঃখে আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল! কথা বলতে গিয়েই দেখি, স্বর ফুটছে না, কান্না এসে গলার স্বর বন্ধ করে দিচ্ছে। কোনরকমে একটু সামলে নিয়ে বলে উঠলাম,—যা খুশী তুমি ক'রো, আমি আর কিচ্ছু ব'লব না।

ও চোখ খুলল এই সময়, বললো—কে দরজা ঠেল্‌ছে!

চম্‌কে উঠে ব'ললাম,—কে ?

কোনো সাড়া নেই। ব'ললাম,—কী ব'লছ? কে আবার দরজা ঠেলবে ?

ও ব'ললে—বাপু আসতে পারে।

—কেন ?

তেমনি কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ গলায় ও ব'ললে—আমায় ডাকতে।

বুঝলাম ব্যাপারটা। বুঝে, চুপ করেই রইলাম।

ও বললে,—বাপুকে বোলো, আমি যেতে পারব না।

—কেন ?

বললে—ব'লবে, আমার তবিয়ৎ ভালো নেই।

বলে উঠলাম—তোমার আর-আর কোথায় লেগেছে, বলো।

বললে—কোমরে বড্ড লেগেছে, আর ডান হাঁটুটায়। হাঁট্‌তে পারছি না।

বললাম—দেখি ?

ধমকের সুরে বলে উঠলো—না, দেখতে হবে না।

বললাম—তুই চেঁচালি না কেন ?

—কী হতো ?

বললাম—লোকজন ছুটে আসতো।

—তা আর নয় ? কেলেঙ্কারীর একশেষ !

বললাম—আমাকে এসে ধ'রত তারা। তোকে তো অমন মার খেতে হ'তো না !

এতক্ষণে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটের কোণে। বললো,—মরদলোক ওরকম মারধোর করেই।

—তা'বলে এ-রকম ক'রে সব তুই সয়ে যাবি ?

হাতটা নেড়ে কপালটা দেখালো, বললো—নসীব ! ভাগ্য !

বললাম—তুই জেনে রাখ্, আর কোনোদিন কিছু ব'লব না তোকে।

এবার স্পষ্টই একটু হাসলো। বললো—সব মরদই ও-রকম বলে, সময়মতো আবার ভুলে যায় !

—আমি ভুলবো না।

—দেখা যাবে।

বাবুজী, সে রাত্রে সত্যিই ওর বাপুকে ও ফিরিয়ে দিলো। বললো —পড়ে গিয়ে চোট্ পেয়েছি।

—যেতে পারবি না ?

—না।

ওর বাপ বললে,—সাহেবকে গিয়ে ব'লব ?

—দরকার নেই।

—কেন ?

মুন্নী বললে—শহুরে মরদদের কথা তো জানো ? দরদ দেখিয়ে ঠিক চলে আসবে এখানে।

ওর বাপ বললে—সাহেবকে তা'হলে কী ব'লব, সেটা বল্ না ?

—ঐ তো বললাম—তবিয়ৎ আচ্ছা নেই।

ওর বাপু আর কিছু ব'লল না, লণ্ঠন হাতে যেমন এসেছিল, অন্ধকারের বুক চিরে আবার তেমনি নীরবে ফিরে গেল বাংলোর দিকে।

বাবুজী, পরদিনও ও গেল না। সেদিন আমিই ব'ললাম—যা না মুন্নী ?

ধমক দিয়ে ব'লে উঠল,—না।

কপালের পটি-টা তেমনি বাঁধা আছে, ওটা আর খোলে নি। বললাম—বাঁধনটা খুলবি না ? ঘা-টা দেখি ?

এবারও ধমক,—না। দরদ দেখাতে হবে না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকই ও গেল বাংলোয়—তার পরদিন। কপালের পট্টি তেমনি রইল বাঁধা, শুধু শাড়ীটা বদ্‌লে নিলো, মুখে পাউডার ছুঁইয়ে দিলো। বললো—একবার দেখা দিয়ে আসি। নইলে হিতে বিপরীত হবে। লোকটা সরাব খায়! এসে হাজির হবে এখানে, তোর সঙ্গে লাটালাঠি বেধে যাবে।

বললাম—না, তা আর বাধবে না। কেউ এলে আমি জুবেদার কাছে চলে যাবো। জুবেদার সামনে খাটিয়া নিয়ে শুয়ে থাকবো।

বললে—তা হোক, তবু যাই,—কী বলিস ?

ব'ললাম—যা!

চলে গেল ধীরে ধীরে পা ফেলে। ওর হাঁটুর ব্যথা এখনো যায়নি, পা খানা এখনো একটু টেনে-টেনে চল্‌ছে দেখছি।

বাবুজী, আমার ততক্ষণে সয়ে গেছে! কাঠুরেরা বনে গিয়ে যখন প্রথম কোপ্‌ বসায় গাছের ডালে, তখন তাদের মনে হয় সারা বন যেন ব্যথায় চীৎকার ক'রে উঠলো। তাই তারা পরের কোপটা দেবার আগে একটুক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায়। তারপরে আর কোনো বাধা নেই, গাছটার তখন স'য়ে গেছে। ঘা-এর পর ঘা দিয়ে-দিয়ে ডালটা নুয়ে ফেললো কাঠুরেরা, গাছ তখন নির্বিকার, চোট্‌গুলো তার স'য়ে গেছে!

আমারও তাই হলো বাবুজী, চোট্‌গুলো সব সয়ে এলো। এটুকু সান্ত্বনা ছিল, আর যাই হোক, ওর 'পেয়ার' তো আমি পেয়েছি! অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা লাভও আমার হয়েছিল।

বলে, আব্বাসী এই সময় কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। সে নীরবতা আমিই ভঙ্গ করলাম সর্বপ্রথম। জিজ্ঞাসা করলাম,—কী লাভ তোমার হয়েছিল, আব্বাসী?

আব্বাসী আমার কথার উত্তর না দিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমিও চোখ ফেললাম বৃন্দাবন-উদ্যানের চতুর্দিকে। সমস্ত উদ্যানটি কখন জনহীন হয়ে গেছে কে জানে, ফোয়ারাগুলো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কোনোদিকে কোনো সাড়া শব্দ নেই, রাত গভীর হয়ে গেছে।

চম্‌কে উঠে আব্বাসী বললে—ঈস্‌, রাত অনেক হয়ে গেছে। খানারও দেরী হয়ে গেল।

—তাতে কী হয়েছে?

আব্বাসী তাড়াতাড়ি তার ক্র্যাচ্‌টির সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে ডেকে উঠলো,—আপ্পা—আপ্পা!

আপ্পা তার ঘরের দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বোধ করি

ঘুমিয়েই পড়েছিল। ভাইয়ের ডাকে তাড়াতাড়ি জেগে উঠলো, একটু অপ্রস্তুত বোধ করে উঠেও দাঁড়ালো, বললো,—খানা তৈয়ারী ভাইসাহেব।

আব্বাসী আমার দিকে ফিরে অনুনয়ের সুরে বললে—আসুন বাবুজী, দুটো মুখে দেবেন।

আপ্পা ততক্ষণে দাওয়ায় উঠে আমাদের খাদ্য-পরিবেশনে তৎপর হয়ে উঠেছে। ভাত-ডাল-তরকারী-ঘি—আবার পাঁপর, ঘোল,—নিরামিষ মাদ্রাজী খাবার যেমন হয়, তেমনি ; খেতে বসে মনে হলো, রীতিমত ক্ষিদে পেয়েছে আমার!

ব'ললাম,—তোমরাও বসে পড়ো আব্বাসী।

আব্বাসী যদিই বা রাজী হলো, আপ্পা কিছুতেই সম্মত হলো না। সে আমাদের দু'জনকে খাইয়ে তবে নিজে খাবে।

অগত্যা তার ব্যবস্থাই মেনে নিতে হলো। তার সযত্ন পরিবেশনে আমাদের খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তখন আব্বাসী মুখ তুলে বলে উঠল,—বাবুজী, আজ আর বাড়ী ফেরা হবে না।

বললাম—বাস্ পাবো না?

আব্বাসী বললে—কোথায় বাস্? রাত কী কম হয়েছে নাকি? গল্পে-গল্পে আমিই আপনার দেরী করিয়ে দিয়েছি।

একটু হেসে বললাম—তা হোক, কিন্তু তোমার কথা শুনতে শুনতে আমারও একটা লাভ হয়েছে আব্বাসী।

'লাভ' এর কথায় মুখখানা ফেরালো আমার দিকে, বোধহয় আপ্পাও উৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

অস্ফুট কণ্ঠে আব্বাসী বললে—কী লাভ, বাবুজী?

ব'ললাম—তোমার কাহিনীর আলোয় আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রাপ্রণালীটাকে একবার নতুন করে দেখে নিলাম। তোমার

'মুন্নী' আমাদের পরিবেশে আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু থাকলেও, আমাদের 'মুন্নী' যে পদে পদে তার বিবেকের দংশন-জ্বালার সম্মুখীন হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আব্বসী কথাটা কতদূর বুঝতে পারলো জানি না, কিন্তু তখন আর কোনো কথা ব'লল না। আচমন প্রভৃতি সেরে আমরা যখন আবার আমাদের খাটিয়া আশ্রয় করেছি, কথাটা সে তুললো সেই সময়! বললো—বিবেকের দংশনজ্বালা কেন, বাবুজী?

ব'ললাম,—দেখ, আমাদের সমাজে মেয়েদের সতীত্বের স্থান অনেক উঁচুতে। তোমাকে কতদূর বোঝাতে পারব জানিনা, মেয়েদের 'সতীত্ব'-ধারণার গোড়াকার কথাটা ছিল শ্রদ্ধা,—শাসন নয়। সমাজ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো বলে মেয়েরা 'সতীত্বে'র মর্যাদা রাখবার চেষ্টা ক'রত। কিন্তু, পরবর্তী কালে, সমাজ স্বার্থান্বেষীদের করকবলিত হয়ে পড়ে। তখন এটা কঠোর শাসনে এসে দাঁড়ায়। তুমি কি জানো, এখনো দেড়শো বছর হয়নি,—আমরা মেয়েদের জোর করে মৃত স্বামীর চিতায় শুইয়ে তাদের পুড়িয়ে মারতাম? আব্বাসীর জানা ছিল না সংবাদটা, তাই সে শিউরে উঠল। বললে—তারপর?

বললাম,—আজ পৃথিবী যখন সমস্ত শাসনের বাইরে চলে আসতে চাইছে, তখন মেয়েরা সামাজিক শাসনের বাইরে আসতে চাইবে না কেন? সতীত্বের ধারণা তাই আজ বদ্‌লাচ্ছে। কেউ কেউ এমন কথা বলছেন, এটা একটা কুসংস্কার নয় ত? 'কুসংস্কার'ই হোক আর 'সু-সংস্কার'ই হোক, ব্যাপারটা একটা 'সংস্কার'তো বটে, এই সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠা বড়ো শক্ত। এই সংস্কারের বোধকেই আমি 'বিবেক' বল্‌ছিলাম। যে মেয়ে অবস্থাবিপর্যয়ে তোমার মুন্নীর মতো ভাগ্যান্বেষণে নেমেছে, সে মেয়েও যে আমাদের সমাজে এই 'বিবেক' বা সংস্কারের দংশন থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত, এমন আমার মনে হয় না। সেদিক থেকে তোমার 'মুন্নী' আমার কাছে অভিনব বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা শুনে আব্বাসী চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ, সরাসরি কোনো উত্তর দিল না। আপ্পা ততক্ষণে আমাদের দু'জনকে দুটো পানের খিলি দিয়ে গেল। চমকে বললাম—পেলে কোথায়?

আপ্পা সসংকোচে বললো—শহর থেকে আনিয়েছিলাম।

বলেই, সে আর দাঁড়ালো না, চলে গেল ঘরের ভিতর। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সে ফিরে এলো দুটি চাদর আর বালিস নিয়ে। বললাম—এসব আবার কেন? শোওয়া কি আর হবে? গল্প করতে করতেই রাত কেটে যাবে।

আব্বাসী বললে—না বাবুজী, শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। কাল সকালে বরং—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—তুমি খেপেছ? শেষ না শোনা পর্যন্ত আমার ঘুমই আসবে না—অবশ্য, তোমার যদি কষ্ট না হয়।

আব্বাসী একটু ম্লান হেসে বললে—না বাবুজী, আমার কষ্ট হবে না। এমন করে যে আমার কথা কেউ শুনতে চাইবে, এ-কি আমি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম?

আপ্পা ততক্ষণে আবার ফিরে গেছে ঘরের ভিতরে। তার চলার গতিটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ ক'রে আব্বাসী বলে উঠলো—এই গরমে ঘরের ভিতরে শুবি নাকি?

আপ্পা ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দিলো,—হ্যাঁ।

ওদের কথোপকথন চলছিল ওদের নিজেদের ভাষায়। আমার তা' বোঝবার কথা নয়; তবু, ওদের বলার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, এই কথাই ওর বলাবলি করলো।

ভাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো আব্বাসী। বললো,—আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে ও থাকতে চায় না। আমি

ওর দাদা, আমার জিন্দ্‌গীর এ-সব কথা ও শুনবে কেন? ওর শরম হয় না? আপনাকে কী ব'লব, কোনোদিন একটা কথাও আমাকে ও জিজ্ঞাসা করেনি! বাবুজী, আমার ভাই বলে বলছি না, আপ্পার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। ওর শরীরে মায়া-দয়াও খুব। একটি মাত্র পোস্ট্‌কার্ড ফেলেছিলাম, সেটা পাওয়ামাত্রই ও ছুটে গিয়েছিল গুডালুরে। জঙ্গলে গিয়ে আমার অবস্থা দেখে আমাকে তখ্‌খুনি সঙ্গে ক'রে এখানে—এই বৃন্দাবন বাগে, নিয়ে এলো। কিছুতেই আমার আপত্তি শুনলো না। ব'লল,—তোমার ঠিকানা জানতাম না, জানলে পরে এমন করে থাকতে দেই—এই জঙ্গলে?

বলে উঠলাম,—কী হয়েছিল তোমার অবস্থা, আব্বাসী?

বললে—দেখতে পাচ্ছেন না বাবুজী, আমার একটা পা নেই! গুডালুরে হাসপাতালে ছিলাম অনেকদিন, শেষ পর্যন্ত আমার এই পা-টা কেটেই ফেলতে হয়েছিল।

—কী হয়েছিল?

ম্লান একটু হাসলো আবার। বললো,—আপনাকে একটু আগে বল্‌ছিলাম না,—একটা লাভও হয়েছিল? সে-লাভটা হচ্ছে কী, জানেন বাবুজী! বাংলোতে যে-সব সাহেব আর বাবুজীরা আসতো, তারা সবাই আমার খোঁজ করতো। কেন জানেন? আমি যে মুন্নীর মরদ,—তাই। আমি সামান্য খিদ্‌মদ্‌গার, আমার খরবাখবর করছে সাহেবরা,—বাংলোয় ডেকে পাঠাচ্ছে মাঝে মাঝে,—আর তাই দেখে, হাতীশালার মাহুতরা সব হিংসে করছে,—একী আমার পক্ষে সেদিন কম লাভের কথা ছিল বাবুজী?

একটুক্ষণ থেমে থেকে একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো আব্বাসী,—লাভ আমার আরও হয়েছিল। বাংলোয় নতুন-নতুন লোক এলেই মুন্নী চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তো। বাংলোয় লোক নেই তো, মুন্নীরও সাজ-টাজের দিকে ঝোঁক নেই! ওর সেই আধময়লা পুরোণো

রঙ্-ওঠা ডুরে শাড়ীটা প'রে ঘুরে বেড়ায়, রান্না আর ঘর-গৃহস্থালী করে। না-পরে কপালে কাঁচপোকার টিপ্, না-দেয় গালে বুলিয়ে ওর শখের পাউডার!

বলতাম,—মুখ শুক্‌নো করে ঘুরে বেড়াস্ কেন?

মুখ ঘুরিয়ে বলতো,—ঈস! শুক্‌নো আবার কোথায় দেখলে!

বলেই, ফিক্ করে হেসে ফেলতো। বলতো,—রসে উথ্‌লে পড়ছে!

বলতাম,—বিকেলের দিকে চুলও বাঁধিস না, মুখে পাউডারও দিস্ না,—ভালো লাগে?

রাগ দেখিয়ে বলতো,—শখ কতো! এনে দিয়েছ কখনো চুল-বাঁধবার ফিতে, মুখে ঘস্‌বার পাউডার?

বলতাম,—আমি আর আনব কী? তোকে ওসব এনে দেবার লোকের অভাব আছে নাকি? বাপ এনে-এনে দিচ্ছে শহর থেকে, বাংলোর সাহেবরা উপহার দিচ্ছে।

চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন ছায়া ঘনাতো, বলতো,—হিংসুটে কোথাকার!

বলেই সরে যাচ্ছিল কাছ থেকে, খপ্ করে ধরে ফেললাম ওর হাত। বললাম,—সত্যি বলছি, সাজ-টাজ করলে বেশ দেখায় তোকে!

কিন্তু, কে শোনে আমার কথা? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকলো গিয়ে রান্নাঘরের ভিতরে।

এর পাঁচ-ছ' দিন পরে,—এক বিকেলবেলা। ঘরের দাওয়ায় বসে আছি চুপচাপ,—এমন সময় গুটি-গুটি ওর বাপ এসে দাঁড়ালো কাছে। মাথাটা নুয়ে-পড়া, চোখ তুলে তাকালে মনে হয়, ধূর্ত একটা শেয়াল বুঝি শিকারের খোঁজ পেয়েছে! আমাকে ও আব্বাসী বলে না, বলে—আব্বা।

কাছে এসে ব'ললে—আব্বা যে এমন করে ব'সে আছ? কাজ নেই?

—কাজ থেকেই তো এসে বসেছি।

—জুবেদা কোথায়?

—জুবেদার ছাড়া পেতে এখনো দেরী আছে।

বাপু এবার আসল কথায় এলো। ব'ললে—মুন্নী কী করছে?

ডেকে উঠলাম—মুন্নী-মুন্নী!

সাড়া দিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। বাপ ব'ললে—এক সাহেব এসেছে আজ সকালে। দিন কতক থাকবে।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন? দিনকতক থাকবে কেন?

বাপ ব'ললে—চন্দনের বাগ দেখবে। সরকারী লোক—সঙ্গে পেয়াদা আছে।

মেয়ে ব'ললে—চন্দনের বাগে এখন আবার কী দেখবার আছে?

বাপ একটু রেগে উঠেই ব'ললে—সে সাত-সতেরো কতো-কী থাকতে পারে! সরকারী কামের তুই কি বুঝিস বাপু? লোকজন যাতায়াত করছে সাহেবের কাছে।

বলেই, আমার দিকে মুখ ফেরালো বাপু, মিষ্টি করে ডাকলো,—আব্বা?

—কী?

বললে,—তোদের গুণ্ডা। তাকেও দেখলাম সাহেবের কাছে। ফালতু লোক নেবে। তুই যাবি? ফালতু কিছু রোজগার হতো?

প্রায় চীৎকার করেই ব'লে উঠলাম—না।

তারপরেই দাওয়া থেকে নেমে হনহন ক'রে বেরিয়ে এলাম বাড়ী থেকে। প্রথমে মনে হলো, জুবেদার কাছেই যাই। আজ একটু আগেই না হয় ওকে বন্দী-দশা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো,—না, থাক্। তার থেকে বরং রফিক-চাচার কাছে

যাওয়া যাক। অনেকদিন রফিক-চাচার সঙ্গে বসে-বসে গল্প করা হয় না।

আমাদের বাড়ীর পিছন দিককার মাঠটা ভেঙে কিছুদূর গেলেই রফিক-চাচার কুঁড়েঘর। দাওয়ায় বসে একরাশ কঞ্চি নিয়ে ঘুড়ির কাঠি তৈরী করছিল ছুরি দিয়ে চেঁছে-চেঁছে! আমাকে দেখে চোখ তুললো,—কী রে বেটা,—ঘুড়ি?

—না।

—তবে?

—এম্‌নি।

ব'লেই ওর কাছ ঘেঁষে ব'সে পড়লাম। কঞ্চি কেটে, কঞ্চি চেঁছে-চেঁছে যে কাঠি তৈরী করছে রফিক-চাচা, একমনে তাই দেখতে লাগলাম খানিকক্ষণ। রফিক-চাচা তার কাজ করতে করতেই বললে —ঘুড়ি ওড়াবি না আজ?

—ওড়াবো।

—জুবেদা আসে নি বুঝি?

—এখনো সময় হয় নি।

রফিক-চাচা হাতের কাজ বন্ধ করে আবার আমার দিকে মুখ ফেরালো। বললো—ঝগড়া করেছিস বুঝি মুন্নীর সঙ্গে?

—না তো!

রফিক-চাচা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল; তারপরে হঠাৎ-ই বলে বসলো এক অদ্ভুত কথা! বললে,—ওর বাপ ওকে শিকড়-বাকড় খাওয়ায়, তা' জানিস? খেতে দিবি না। কোলে ছেলে-পিলে আসুক, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কুম্‌কীগুলোর বাচ্চা হলে কী হয়, দেখিস নি?—বাচ্চা ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে চায় না! সেজন্য বাচ্চাওয়ালা হাতীকে দিয়ে আর 'কুম্‌কী'র কাজও চলে না। তবে ওরা হচ্ছে জানোয়ার, বাচ্চা বড়ো হয়ে গেলে, বাচ্চার দিকে

আর ঝোঁক থাকে না, তখন হাতীগুলো আবার 'কুম্‌কী' হয়ে যায়! লেকিন্, জানোয়ারে আর মানুষে অনেক তফাৎ আছে। মুন্নী 'মা' হ'লে আর কি ঘরের বাইরে যেতে চাইবে?

আলোচনাটা আমাকে যেন এক লহমায় অসাড় ক'রে দিলো বাবুজী। আমি এসেছিলাম 'চন্দন-বাগ' সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে। আমি জানতাম, রফিক-চাচা এককালে চন্দন-বাগে কাজকর্ম করেছে, চন্দন-গাছের হদিস ওর জানা। কিন্তু, কোথায় হারিয়ে গেল চন্দনের সুবাস! তার বদলে কথায়-কথায় এসে প'ড়ল কী এক অদ্ভুত প্রসঙ্গ! এ-নিয়ে আলোচনাও করতে চাইনি, এ-জিনিস জানতেও চাইনি!

কিন্তু, রফিক-চাচার কথাগুলো মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দেবার মতো বস্তুও নয়! মনে হলো প্রসঙ্গটা যেন আমার মনের ভূমিতে কেটে-কেটে বসে গেছে, ওকে শেকড়সুদ্ধ শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়!

ভার-ভার মন নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। সোজাসুজিই আসিনি; এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছি কিছুক্ষণ, মনটাকে শান্ত করবার হাজারো চেষ্টা করেছি, তারপরে মুখ ফিরিয়েছি ঘরের দিকে।

এসে দেখি, সাবান দিয়ে চান ক'রে এসেছে মুন্নী; সাবানের সেই গন্ধটা চন্দনের মতো,—ওকে জড়িয়ে মনোরম এক সুবাস বিস্তার করেছে! আমি যখন এসে পৌঁছলাম, তখন ওর সাজের ঘটা শুরু হয়ে গেছে। বাক্স খুলে বাক্স-ভর্তি শাড়ীগুলো টেনে নামিয়ে শাড়ী পছন্দ করছে। বাড়তি টাকা রোজগার ক'রে ক'রে, সেই টাকায় শহর থেকে রঙ-বেরঙের শাড়ী আনাতো মুন্নী,—কখনো বাপের হাত দিয়ে, কখনো বা অন্য শহরগামী খিদ্‌মদ্‌গারদের হাত দিয়ে।

আমার সাড়া পেয়ে মুখ ফেরালো মুন্নী। বললো,—গিয়েছিলি কোথায়?

—কোথাও না।

কথার ধরনে একটু বুঝি চ'মকেই উঠলো। ভ্রূ-ছুটি কুঞ্চিত ক'রে বললে, কী ব্যাপার ? মুখ ভার যে !

ওর খুব কাছে মুখোমুখি বসে পড়লাম। বললাম,—একটা কথা ব'লব ?

—কী কথা ?

মনের নিদারুণ উত্তেজনা মুহূর্তে প্রকাশ পেলো আমার কণ্ঠস্বরে। বললাম,—তোকে শিকড়-বাকড় খাওয়ায় তোর বাপ ?

আমার মুখে এ-ধরনের কথা ও বোধ হয় কখনো আশা করেনি ; প্রথমে চমক, তারপরে কিছুটা রঙ্গ, তারপরে শরম,—এইসব ভাব একের পর এক ওর মুখখানার ওপর দিয়ে খেলে গেল। এবং শেষপর্য্যন্ত, সবকিছু কাটিয়ে উঠে, সামনের শাড়ীটা ছু'হাতে তুলে নিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো,—এই লাল শাড়ীটা পরবো—মানাবে ?

বললাম,—লেকিন, আমার কথার উত্তর কই ?

মুন্নী ঠোঁট উল্‌টে বললে,—ঈস ! ভারী কথা—তার আবার উত্তর !

বললাম,—শিকড়-বাকড় খাবি না—খবরদার !

মুন্নী আমার কথার পিঠে চট্ ক'রে কী কথা যেন বলতে গেল, কিন্তু পারলো না। তার বদলে ওর ছুটো চোখ ভরে গেল জলে, পাট করা লাল শাড়ীটা চোখের ওপর চেপে ধ'রে, দেখতে দেখতে হু-হু করা কান্নায় ভেঙে পড়লো মুন্নী।

আমার মনটা একটু নরম হলো। ওর কান্নার মধ্যেই আমি বললাম,—কাঁদিস্ কেন ? 'মা' হ'তে সাধ যায় না তোর ?

মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সরালো কাপড়, জলভরা চোখছুটিতে মুহূর্তে যেন, বিজলী খেলে গেল, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরলো কিছুক্ষণ, তারপরে বললো,—কার 'মা' হবো ? আমার মতো মেয়ের, না তোমার মতো হাতীর খিদ্‌মদ্‌গার ছেলের ?

বলতে বলতে এবারে একেবারে লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে।

বড়ো মায়া হলো, ওর মাথায় হাত রেখে বলে উঠলাম,—এসব ভাবছিস? তোর মতো মেয়েও সে হবে না, আমার মতো খিদমদগারও সে হবে না।

জলভরা চোখ তুলে তাকালো আমার মুখের দিকে, তারপরে তেমনি ধারালো কণ্ঠেই বললো,—তবে, কী হবে?

বললাম—ছেলে হোক, তাকে আমি শহরে পাঠাবো, 'পঢ়িলিখি আদ্‌মী' হবে সে।

ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো বাঁকা হাসি। বললে,—তাতে কী হবে? লেখাপড়া জানা ভদ্দর লোকেদেরও ত দেখছি। বাংলোয় আসে, আর আমার মতো জংলী মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে সাধে!—থুঃ!

বলে, ঘেন্নায় থুথু ফেলার মত ভঙ্গী করে মুন্নী। তারপরে উঠে বসে। বলে,—বেশ আছি। তোকে আর আজে-বাজে কথা ব'লতে হবে না! কে এসব মাথায় ঢুকিয়েছে তোর—গুণ্ডাটা বুঝি? আসুক এবার ফষ্টি নষ্টি করতে, আপ্পানাকে ব'লে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক চড়-চাপড় লাগিয়ে দেবো!

বলতে গেলাম, আপ্পানা কেন আমি তো আছি! 'গুণ্ডা'র মতো একটা মতলববাজ্‌কে ঠাণ্ডা করতে, কতক্ষণই বা লাগবে?

কিন্তু গলায় কোনো স্বর ফুটলো না বাবুজী। কেমন যেন জড়ের মত হয়ে ব'সে রইলাম। ও আমারই সাম্‌নে চোখে-মুখে জল দিয়ে নিলো, শিশি খুলে মুখে পাউডার-টাউডার ঘসলো, কাঁচপোকার টিপ্‌ পরলো, চুলে বেণী বাঁধলো গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান গাইতে গাইতে। আমি যে একটা মানুষ ঘরের কোণে দেয়ালে মাথা রেখে চুপচাপ বসে রয়েছি, সে দিকে ওর খেয়ালই নেই। জামা পরলো, কাপড় বদ্‌লালো, তারপরে হেলতে-দুলতে চলে

গেল বাংলোর দিকে। এই মেয়েই যে কিছুক্ষণ আগে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিল মেঝের ওপরে, সে কথা কে বলবে?

যাবার আগে একটিবার মাত্র মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললে,—জল আনতে যাচ্ছি।

কথাটা মিথ্যে নয়, মাটির বড়ো কলসীটা তু'হাতে কাঁখে তুলে নিলো।

বলে উঠলাম,—জল আনতে,—না অন্য-কিছু আনতে?

মুচ্‌কি হেসে বললো,—তুই-ই।

ততক্ষণে, দরজার কবাট ছাড়িয়ে দাওয়ায় গিয়ে প'ড়েছে মুন্নী। এক লহমার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে। বললে,—মন খারাপ করিস না। ঐ দেখ তোর জুবেদা এসে গেছে।

বাবুজী, এইরকম ব্যাপার হামেশাই ঘট্‌তো। ও এম্‌নি ক'রেই চলে যেতো বাংলোর দিকে। আর, আমি কী ক'রব—চুপচাপ বসে থাকতাম দাওয়ায়। জুবেদাকেও সেই সময় ছেড়ে দিতো হাতিশালা থেকে, জুবেদা হেলতে-তুলতে এসে দাঁড়াতো একেবারে ঠিক আমার সামনে। শুঁড় দিয়ে চালের বাতা থেকে সুতোভরা লাটাইটা বার করে এনে ডেকে ডেকে উঠ্‌তো। ভাবখানা এই—আর কেন? চলো? বিকেল হয়ে গেল যে! মাঠে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াবে না? সুতো দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখবে না?

আমার তো তখন জওয়ান বয়েস বাবুজী, ভিতরটা এতো সয়েও কঠিন হয়নি, শান্ত হয়নি, তখনো ভিতরটা মাঝে মাঝে গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে। আর-একবার মনে হতো, মাত্র সুতো দিয়ে একটা হাতীকে বেঁধে রাখতে পারি, আর একটা মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখতে পারি না 'পেয়ার' দিয়ে!

না বাবুজী, পারতাম না। ওর রং-ঢং-ছলা-কলার কাছে আমি কোনদিনই জিততে পারিনি, আজকালও পারি না, কেবল হেরেই চলেছি। হেরে চলেছি আমার অবুঝ 'নাদান' দিল্‌টার

জন্য। আমি বুনো মাহুত, আমি ওকে চাব্‌কালেও কারুর কিছু বলার নেই। লেকিন, হাতে চাবুক নেবো কী? আজকাল ওর গায়ে হাত ওঠাতেও আমি পারি না সেই আগেকার মতো। আজকাল ও সামনে এসে দাঁড়ালে, ওর মুখখানা দেখেই মনটা আমার কেমন যেন হয়ে যেতো। ঐ মুখ, ঐ হাত, ঐ ওর নরম শরীর,—ওখানে কশাইয়ের মতো চাবুক ওঠাবো কেমন করে? তা'ছাড়া, আজকাল মনে হতো, বাংলোয় নতুন সাহেব এসেছে, তবেই না সুন্দর শাড়ীখান ও প'রেছে? তবেই না দুই ভ্রূর মাঝখানে পরেছে কাঁচপোকার টিপ্! আর সেই উপলক্ষ্যেই সারা শরীরে ওর এক অদ্ভুত সাড়া প'ড়ে গেছে—যেন ঢেউ উঠেছে দরিয়ায়! মল ঝম্‌ঝম্ ক'রতে ক'রতে যখন বাংলোর দিকে চলে যেতো, তখন মনে হতো,—যেন রাজ্য জয় করতে চলেছে! লাল শাড়ী, ফিকা নীল শাড়ী, কিম্বা হলদে শাড়ী, কাঁখে জলের কলসী,—কোমরটা একটু হেলিয়ে ধীর পায়ে চলে যেতো বাংলোর দিকে। দুদিন কি তিনদিন—কী ব্যাপার? না, বাংলোর কুঁয়ো থেকে জল তুলে আনতে যাচ্ছে। কুয়ো তলায় গিয়ে কতোবার যে জল তুলতো আর ফেলতো, আর গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইত, তার ঠিক নেই! ওর হাব-ভাব দেখতে দেখতে সাহেবদের মাথা ঘুরে যেতে কতক্ষণ?

তারপরেই এলো ওর বাপ। ফিস ফিস কী কথাবার্ত্তা হলো দু'জনের মধ্যে। মুন্নী আর জল আনতে যেতোনা, বিকেল পড়তে-না পড়তেই মল ঝম্ ঝম্ করে চলে যেতো বাংলোর ভিতরে।

যাবার আগে, এক-একদিন, ওর মনের মধ্যে কী হতো কে জানে, হঠাৎ-ই আমার গলাটা জড়িয়ে ধরতো দু'হাতে। জড়িয়ে ধরে, আদর জানাতো। বলতো,—ফিরতে বেশী রাত করবো না, কিচ্ছুটি ভেবো না যেন।

'তুই' নয়, 'তুমি'। 'ভাবিস না' নয়, 'ভেবো না!' লহমায় ও যেন ভদ্দর লোক হয়ে গেছে!

আমিও আর কী করব, হাতিশালা থেকে রাত ক'রে বাড়ী ফিরতাম সে-সব দিন। জুবেদাকে নিয়েই সময় আমার কেটে যেতো। 'গুণ্ডা'টা কাছে বসে হেসে-হেসে ভাব জমাবার চেষ্টা করতো, আমি আমল দিতাম না। মানুষজন তখন ভালো লাগতো না। তখন 'জুবেদা'ই হয়ে দাঁড়াতো আমার একমাত্র সঙ্গী।

এই ভাবেই দিন কাটে। দেখতে দেখতে আবার এসে গেল বসন্ত। গাছের কচি-কচি পাতায় পাতায় হাওয়া এসে আদর করে, হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝরা পাতাদের। 'দীনসাহেব'-এর পর 'রফিক চাচা'ই হয়েছে আমাদের সর্দার, একদিন তিনি ডেকে আমাদের বললেন,—শাদী দিবিনা জুবেদার?

গুণ্ডা কাছেই ছিলো, বললে,—মরদ কই?

চাচা বললেন,—ভিন্ গাঁয়ে একটা হাতী 'মত্ত' হয়েছে। সেখানে নিয়ে যেতে হবে ওকে।

আমার মনের ভিতরটা হঠাৎ হু-হু ক'রে উঠলো কথাটা শুনে। বলে উঠলাম,—নাই বা হলো জুবেদার শাদী!

রফিক চাচা একটু হেসে বললেন,—তাই কি হয় নাকি?

বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল, তবু ব'ললাম,—কিন্তু, ও যদি ফিরে না আসে?

হি-হি ক'রে পিশাচের মতো হেসে উঠলো গুণ্ডা, বললে, না আসে না আসবে! ও দুঃখ সওয়া তোমার অভ্যাস আছে!

—কী বল্লি!—ব'লে, হুংকার দিয়ে পড়েছিলাম ওর ঘাড়ের ওপর। আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে ও একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। আমি তখ্‌খুনি চেপে বসলাম ওর বুকে। সেদিন রক্তারক্তি কাণ্ডই একটা হয়ে যেতো, যদি না কাছে থাকতেন

রফিক-চাচা। তিনি আমাদের দুজনকে ছাড়িয়ে দিলেন। একটু ধমকও দিলেন, বললেন,—হয় কি তোমাদের? দেখা হলেই ঝগড়া আর মারামারি? ভালো কথা নয়। জঙ্গলে আদ্‌মি মাত্রেই ভাই-ভাই, দুষ্‌মন নয়।

ফিরে এলাম। গুণ্ডার 'রোখ্‌' বাড়লো, ও জোর ক'রে নিজে চালিয়ে নিয়ে গেল জুবেদাকে ভিন্‌ গাঁয়ে। রফিক-চাচা ব'ললেন, ভালোই হয়েছে। তোর দিল যখন শাদীতে রাজী হচ্ছিল না, তখন ও-ই যে নিয়ে গেছে ওকে, ভালো হ'য়েছে।

'গুম্‌' হয়ে রইলাম, কোনো কথা ব'ললাম না।

উনি বললেন,—যা এবার, বাড়ী যা।

বাংলোতে সাহেব এসেছে, মুন্নী বিকেল হলে কি আর বাড়ী থাকে? আমি 'বাউরা'র মতো ঘুরতে লাগলাম জঙ্গলের মধ্যে। একটা খেঁকশিয়ালী গর্ত থেকে উঠে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল, হাতের ছোট লাঠিটা ছুঁড়ে মেরে ফেলি ওটাকে। ওটা জিভ্‌ বার ক'রে চোখ উল্‌টে ম'রে পড়ে থাকবে, আর তা দেখতে-দেখতে আমার কলিজার আগুনও ঠাণ্ডা হবে!

কিন্তু, ঐ ইচ্ছা হওয়াই সার! কাজে কিছুই করতে পারলাম না, খেঁকশিয়ালীটা দূরের চন্দন-বনের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

তারপরে একটা হাওয়া জাগল চন্দন-বনে! হাওয়া যেন দুটো গাছের মাথাকে কানাকানি করবার জন্য আরও কাছে এনে দিলো। কানাকানি করলো না তারা, শুধু খুসিতে হাসতে-হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়লো!

আর সঙ্গে সঙ্গে দীন মহম্মদ সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ে গেল ওঁর সেই শেষ সময়কার কথা! চন্দন-বনের কী-এক 'কহানী' উনি শুনতে চেয়েছিলেন না? কিন্তু কী সে কাহিনী? রফিক-চাচাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমিও

একদিন ফিরে এসেছিলাম। কী-এমন অদ্ভুত কাহিনী লুকিয়ে আছে ঐ চন্দন-বনকে ঘিরে, যা মানুষের শেষ সময়েও মানুষ শুনতে চায়?

কিনারা হলো না আমার প্রশ্নের। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম বাড়ীতে। দরজায় শিকল তোলা, ঘরে মুন্নী নেই। রান্নাঘরে আমার খাবারটা প'ড়ে আছে ঢাকা-দেওয়া। খেয়ে নিয়ে এসে চুপচাপ প'ড়ে রইলাম খাটিয়ায়। কতো রাত্রে মুন্নী ফিরে এসেছিল জানি না, আচম্‌কা একটা ছোঁয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেয়েছিল। সাড়া অবশ্য দেই নি, অনুভবে বুঝলাম, আমার মাথার নীচে কে যেন একটা বালিশ দিয়ে দিচ্ছে। কে যেন আমার খাটিয়া থেকে ঝুলে-থাকা হাতখানা আস্তে উঠিয়ে পাশে রেখে দিচ্ছে! অন্য সময় হলে এ আদরে গলে পড়তাম; কিন্তু, মনের অবস্থা তেমন ছিল না, পাথরের মতো নিঃসাড় প'ড়ে রইলাম খাটিয়ার ওপরে। মাটিতে মাদুর পেতে খোলা চুল শিয়রের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ও শুয়ে পড়লো দেখলাম, কুলুঙ্গীতে পিদ্দীমের আলোটা কাঁপতে কাঁপতে একসময় নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে দিলো, এ-ও টের পেলাম। কিন্তু তারপরে আর কিছু মনে নেই। সওদাগরের সওদার চিন্তা আর গরীবের 'ভুখ'-এর চিন্তা একাকার ক'রে দেয় যে গভীর ঘুম, সেই ঘুম এসে আমার চেতনার সব বাতি একে একে নিভিয়ে দিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙলো সেই শেষ রাত্তিরে, দুনিয়া তখনো পুরোপুরি জেগে উঠেনি, দুটো একটা পাখা কলরব করছে শুধু এ-ধারে ও-ধারে। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কার যেন চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠার আওয়াজ! পরে মনে হলো, মেয়েমানুষকে লাঠির বাড়ী মারলে সে যেমন ভয়ে আর ব্যথায় কঁকিয়ে ডুকরে ওঠে, ঠিক তেম্‌নি মেয়েলী গলার স্বর শুনলাম! কিন্তু, তৃতীয় বারে আর ভুল হলো না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম বিছানায়। মুন্নী পাশ ফিরে

শুয়ে আছে ঘুমে অচেতন হয়ে, আমি একেবারে ছুটে গিয়েই দরজা খুলে দাওয়ায় এলাম। পাগলের মতো ডেকে উঠলাম, —জুবেদা !

দাওয়ার কাছ থেকেই সাড়া পেলাম। এগিয়ে গিয়ে ওর গলায় রাখলাম দুটি হাত। ও শুঁড় তুললো। যেন বলতে চায়, লাটাই নিয়ে চলো—খেলা করি।

—না খেলা নয়!—পাগলের মতো ওর গায়ে মুখ ঘসতে লাগলাম, বললাম,—এসেছিস ! এসেছিস ফিরে !

ততক্ষণে দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে মুন্নী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। বললে,—সক্কাল বেলায় কী শুরু করলে ? ওটা এসে জুটলো কেন, এই সাত-সকালে ?

বলে উঠলাম,—ওর শাদী দেবার জন্য ওকে নিয়ে গিয়েছিল 'মস্ত্' হাতীর কাছে, ভিন্ গাঁয়ে ! দেখেছ, ফিরে এসেছে ; শাদী না ক'রেই ছুটে পালিয়ে এসেছে আমার কাছে। ওর পায়ে ছেঁড়া দড়িটা এখনো ঝুলে রয়েছে ঐ দেখ !

একটু ঝুঁকে পড়ে জুবেদার পায়ে বাঁধা মোটা দড়ির ছেঁড়া অংশটুকু দেখতে লাগল মুন্নী। বললাম,—দেখেছ সাচ্চা মহব্বৎ আছে কি না ? ও জানোয়ার, তবু 'মহব্বৎ' এর দাম ও দিতে জানে !

মুন্নীর মুখের দিকে আর তাকিয়েও দেখিনি, জুবেদাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম বনে, গভীর থেকে গভীরতর বনে। ওকে খাওয়ালাম, ওকে নিয়ে বেড়ালাম, ওর সঙ্গে পাগলের মতো বক্‌বক্ করলাম সারাক্ষণ। পাখাগুলো উড়ে উড়ে যেতে লাগলো এ-ডাল থেকে ও-ডালে। একটা লম্বা সাপ পাখার বাসার খোঁজে গাছে উঠেছিল কিছুদূর পর্যন্ত। পাখা-মা আর পাখা-বাপের ঠোক্‌রানি আর চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে নীচে নেমে এসে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে

দেখতে। সাপটা লুকিয়ে পড়তেই থমকে-দাঁড়িয়ে-পড়া জুবেদা আবার চলতে শুরু করলো। ওর কাঁধে ছিলাম আমি, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,—আর না, এবার ফিরে চল্। আমার ভুখ্ লাগেনা না? গিয়ে দেখবো, মুন্নী মুখ ভার ক'রে বসে আছে!

মুন্নার গম্ভীর মুখখানা কল্পনা করেই হো হো করে হেসে উঠলাম আমি জঙ্গল কাঁপিয়ে।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই জঙ্গলে সাড়া জাগলো! রফিক চাচা আমাদের সবাইকে ডেকে বললে,—তৈরী হও সব, খেদায় যেতে হবে।

লোকজন এসে গেল ভিন্ গাঁয়ের। বন্দুকধারা শিকারীও এলো শহর থেকে। তাদের মধ্যে যিনি সাহেব মানুষ, তিনি এসে উঠ্লেন বাংলোতে। লম্বা-চওড়া দিব্যি ফুটফুটে চেহারা; নাম শুনলাম,—সাহজলাল। রফিক-চাচা তাঁকে চিনতো, বললে,—শহরে সরকারী দপ্তরে ওকে দেখেছি। ফৌজী সিপাই ছিল।—সিপাই কেন, 'অফ্সর!'

'অফসর' শুনে আমাদের সম্ভ্রম জাগলো মানুষটির প্রতি। গুণ্ডা কাছেই ছিলো, আমাকে ডেকে বললে,—ভাইসাব, খেদায় রওনা হবো, ঝগ্ড়াঝাঁটি ভুলে গিয়ে এসো দু'জনে 'দোস্ত্' বনে যাই।

ওর মনের ভাবটা ঠিক বুঝলাম না। সত্যিই মনের কথা বলছে—না, বানিয়ে-বানিয়ে মন-রাখা কথা বলছে? ওকে বিশ্বাস করাও যে শক্ত!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে 'গুণ্ডা' হেসে ফেললে। তারপরে

নীচু গলায় বললে,—এবার কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যা এ যাবৎ এখানে কখনো হয়নি।

বললাম,—কী? খেদা?

—দূর! তা কেন?—গুণ্ডা বললে,—খেদা ত বছরে একবার-দুবার ক'রে হচ্ছেই। সে কথা বলছি না। বল্‌ছি, এবার 'তাজ্জব কা বাৎ'—এক বাংলোয় দু'জন সাহেব।

বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠলো কথাটা। আমাদের বাংলোয় 'সাহেব' আসে সত্যিই একজন ক'রে। একজন থাকতে আরেকজন আসে না, অন্ততঃ আমি তো কখনো দেখিনি! এবারে, সেই 'চন্দন গাছ দেখবার সাহেব' তো রয়েছেই, তার ওপরে এলো এই শিকারী। 'চন্দন গাছের সাহেব' মুন্নীর জন্যই যাই-যাই ক'রেও যাচ্ছে না চ'লে।—তার ওপরে, শিকারী সাহজলালেরও চোখ যদি পড়ে ওর ওপরে?

কথাটা ভাবতে-ভাবতে মনে একটা ভয় হলো প্রথমে। কীসের ভয় বলতে পারবো না, কিন্তু ঠিক একটা ভয়ের অনুভূতি। হঠাৎ 'ভয়' পেলে মানুষের মনে যে রকমটা হয়, ঠিক তেম্‌নি। আর তারপরে ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে গেল, এলো একটা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি! মনে হলো, সাহজলাল-সাহেবের চোখ যাতে মুন্নীর ওপর তাড়াতাড়ি পড়ে, তার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? চোখ পড়বার পর তিনি ওকে চাইবেন, ওদিকে 'চন্দন গাছের সাহেব'টারও টনক নড়বে,—হয়ত' দু'জনে লড়াই লেগে যাবে; খুনোখুনি করে মরবে দু'জনে,—আর, সে ছবি যেন এখনই দেখতে পাচ্ছি দু'চোখ মেলে। দেখছি, আর মনটা খুশীতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে!

তারপরে, একদিকে চললো খেদার আয়োজন, অন্যদিকে চলতে লাগল আমার মনের গোপন ইচ্ছাটাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা। সরাসরি মুন্নীর বাপের কাছে না গিয়ে আমি আপ্পানাকে গিয়ে

ধরলাম। সে ত সব সময়ই সরাবে ম'জে থাকে, সে সময়ও ছিলো। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম,—সাহজলাল সাহেব কেমন লোক?

আপ্পানা চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে ব'ললে,—বড়ো শিকারী, 'তাক্‌' ঠিক আছে, সেদিন এক গুলীতেই এক পাখী—

বিরক্ত হয়ে বললাম,—থাম্‌ তুই। আমি সে 'তাক্‌'-এর কথা জিজ্ঞাসা করছি না,—বলি, অন্য 'তাক্‌তুক্‌' কিছু—

আপ্পানা এবার কথাটা বুঝতে পেরে টেনে টেনে হাসতে লাগলো, বললে,—এ-সাহেবটাও সরাবী আছে, আমার খুব সুবিধে—

বললাম,—শুধুই সরাবী, আর কিছু নয়?

আপ্পানার মুখখানা দেখতে-দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল, বললে,—'না' আর বলি কী ক'রে? জানিস, এ-জঙ্গলের হাওয়াটাই খারাপ, যে আসে, সেই-ই—

আর থাকতে না পেরে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম,—কী হয়েছে, বল্‌ না?

আপ্পানা বললে—নজরে পড়েছে।

—কে?

আপ্পানা বললে—আবার কে? তোর বউ। সাহেব বললে—ও কে রে? ঐ-সাহেবটার ঘরে গেল কেন? তখন বললাম সব কথা।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম—কী বললে সাহজলাল?

—ব'ললে,—ওকে আমার চাই।

—তারপর?

আপ্পানা বললে,—আমি বললাম,—তা কী ক'রে হয় সাহেব, ও-সাহেব টের পাবে না? তোমাকে অন্য মেয়ে এনে দিচ্ছি, অন্য জংলী মেয়ে।

—কী ব'ললে সাহেব ?

—বললে,—জংলী চাই না। বললাম, মুন্নীও জংলী। তা' সাহেব বিশ্বাসই করতে চায় না।

ব'ললাম—আচ্ছা আপ্পানা, মুন্নীকে বলেছিস এ-কথা ?

—না।

চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে একটা কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভাবলাম, মুন্নীকে গিয়ে যদি নিজে সরাসরি কথাটা বলি ত' কেমন হয় ?

আপ্পানা তার কথার জের টেনে ব'লে চলেছে—বাংলোর এই বুড়োটা যে মুন্নীর বাপ, সাহেব তা কী করে যেন জেনে ফেলেছে। তাই, এ-সব কথা বুড়োর সঙ্গে বলে না, বলে আমার সঙ্গে।

আমি ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে রইলাম, তারপরে এক সময় উঠে এলাম ওর কাছ থেকে, বাড়ীতে।

বিকেলের দিকে, মুন্নী যখন মেঝেতে হাঁটু মুড়ে ব'সে ছোট্ট আয়নায় মুখ দেখছে আর চুল বাঁধ্‌ছে, তখন আমি বলে উঠলাম কথাটা। বললাম,—জল তুলতে যাবি না, বাংলোয় ?

মুন্নী কথাটার উদ্দেশ্য ঠিক না বুঝে আমার মুখের দিকে ভ্রূ-কুঁচ্‌কে তাকালো, তারপরে ঝাঁঝ দিয়ে বলে উঠ্‌লো,—মরণ! জল আনবার দরকার কী ? আমি সাহেবের চা বানিয়ে দিতে যাচ্ছি।

—কোন্‌ সাহেবের ?

এবারে অবাক হলো মুন্নী, বললে,—তার মানে ?

একটু হেসে বললাম,—বাংলোতে আরেকজন সাহেব এসেছে যে !

ও বললে—জানি। তা' আমি করব কী ?

ব'ললাম—সে যদি তোকে চায় ?

ব'ললে—ঈস্‌, চাইলেই অম্‌নি হলো !

ব'ললাম—দু-একবার জল তুলতে যা না, ঠিক নজরে প'ড়ে যাবি।

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো মুন্নী। তারপরে হাসি থামিয়ে ব'ললে,—কিন্তু, তোর আজ হলো কী? আমার যাবার ব্যাপারে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

ব'ললাম—মাথাব্যথা আবার কী! তুই যেমন ব্যবসাটাকে ব্যবসা হিসাবে নিয়েছিস, আমিও তাই। তোর দৌলতে টাকা ত আসছে! খাচ্ছি দাচ্ছি—ভালোই ত আছি!

চোখ ঘুরিয়ে বললে,—বুঝিস্ সেটা?

—বুঝি বই কি?

ও হঠাৎ উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়ালো। দু'টি হাত আমার গলায় মালার মতো রেখে আদরে-গলে-যাবার-মতো সুরে বলে উঠলো,—এই ত আমার সাচ্চা মানুষটি! যতো যা-ই করি না কেন, আমার পেয়ারের মানুষ—তুমি—তুমি—তুমি!

বাবুজী, ওর এই আদরে আমার ভিতরকার সেই 'দুষমন'টির কাঁচের শরীর যেন খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে গেল। যে 'দুষমন' আমার ভিতরে এসে দুই সাহেবের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়ে মজা দেখতে চাইছিল,—সে একেবারে শেষ হয়ে গেল। আমার দুটি চোখ ভরে উঠলো জলে, কোনো রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। অনেক আমার কাজ।

দু-একদিনের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম রফিক-চাচার সঙ্গে জঙ্গলের একেবারে ভিতরে। সাহজলাল সাহেব বন্দুক হাতে ছিলেন আমাদের সঙ্গে, যদি কোনো বিপদ-আপদ দেখা দেয়, তার জন্য।

তা প্রায় ক্রোশ চারেক ভিতরে ঢুকেছিলাম আমরা। অনেক ভেবেচিন্তে—অনেক বেছেবুছে—একটা জায়গা আমরা ঠিক করলাম। সেখানে দিনকতক ধ'রে ঠক্‌ঠকাঠক্ শুরু হয়ে গেল। প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু ক'রে কাঠের বেড়া দিলাম আমরা শক্ত করে। সত্যি

কথা বলতে কী, এ-কাজে ক'দিন আমরা এতো বিভোর ছিলাম, যে, নাওয়া-খাওয়ারও সময় ছিল না।

বাবুজী, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। 'খেদা' তৈরী ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলের চারধারে। হাতীর খবর করতে হবে। কে যেন এসে সঠিক খবর দিয়ে গেল একদিন। ঠিক এইবার শুরু হবে আমাদের আসল কাজ। গোটা চারেক 'কুম্‌কী' নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একদিন। মুন্নী বললে—সাবধানে থেকো।

আমি ওর সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করলাম। ব'ললাম—ওদিকে কতদূর?

—কী কতদূর?

—সাহজলাল সাহেব?

মুখ ঘুরিয়ে রাগ করে বললো—যাও, দুষ্টুমী করতে হবে না!

হাসতে-হাসতেই বেরিয়ে আসছিলাম। মনটা খুসীতেই ভরা ছিল। জুবেদাকে গিয়ে বললাম,—জুবেদা, একটা দাঁতালকে তোর আজ ধরা চাই-ই!

জুবেদা শুঁড় তুলে তার 'আনন্দ' জানালো।

বাবুজী, খেদার ব্যাপারে 'কুম্‌কী'র লালচ্‌ দেখিয়ে হাতী ধরা যতোটা সহজ মনে হয়, ততটা সহজ নয়। প্রথম কথা, হাতীটাকে দল থেকে বার করে আনতে হবে। তারপরে, সে বাউরার মতো 'কুম্‌কী'র পিছনে পিছনে ছুটে আসবে। 'কুম্‌কী' তখন ছুটবে খেদার দিকে, আমাদের কাজ হবে তখন সুযোগ বুঝে বুনো হাতীটাকে বেঁধে ফেলা। অনেক সময় হাতীগুলোকে ভয় পাইয়ে খেদায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, আমরা সেবার যা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে, কুম্‌কীর সাহায্যে হাতী ধরা। আর, এভাবেই হাতী ধরার রেওয়াজ ছিল আমাদের মধ্যে বেশী। কিন্তু, এসব কথা থাক বাবুজী, আমি আসল কথায় আসি। সেবার নতুন হাতীকে বেড়াজালের মধ্যে টেনে আনতে গিয়ে একটা ভয়ানক 'বিপত্তি ঘটে গেল। যখন

বার হয়েছিলাম, মনটা তখন খুব 'খুশ' ছিল বাবুজী, ঐ যে ছলছল চোখে মুন্নী বলেছিল,—'সাবধানে থেকো।' সেই কথাটা, আর ওর মুখখানা চোখের সামনে ভাসছিল অনেকক্ষণ ধ'রে। বনের মধ্যে যখন ঢুকলাম তখন মনে হলো, হাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো সব স্থির হয়ে গেছে। শুধু ঝরা পাতার ওপর আওয়াজ তুলে তুলে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম।

গুণ্ডা ছিল আমার পিছনে, চেঁচিয়ে বললে,—তোমার জুবেদার কিরকম স্ফূর্তি দেখেছো, আজ ও-ই শিকার ধ'রবে দেখো।

ওর পরিহাসের সুরের সঙ্গে সুর মেলানোই উচিত ছিল আমার বাবুজী, কিন্তু গলাটা কে যেন ভিতর থেকে চেপে ধরেছে, গলায় স্বর ফুটলো না। মনে হচ্ছিল, বনের লতাপাতারা কী একটা দুর্ঘটনার আভাস পেয়েছে, ওরা তাই থমকে স্থির হয়ে আছে, বাতাস বন থেকে দূরে সরে গেছে কিসের যেন নিশানা পেয়ে।

গুণ্ডা পিছন থেকে হেসে ব'ললে,—কই হে, চুপ হ'য়ে গেলে যে! বউয়ের কথা মনে পড়ছে নাকি?

এবারেও কোন সাড়া দিলাম না। কেন যে দেই নি, তা' আপনাকে বোঝাতে পারবো না বাবুজী। কিছু একটা ঘ'ট্‌বার আগে মানুষের মন বোধ হয় জানতে পারে। আর পারে বলেই হঠাৎ সে চুপ হয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা হাতীর পালের কথা জানতে পারলাম। রফিক চাচার কথা মতো আমরা ঘিরে ধ'রলাম দলছুট একটা হাতীকে। হাতীটা দাঁতাল। আমিই গেলাম এগিয়ে জুবেদাকে নিয়ে। আরও একটা দলছুট হাতীকে ধরবার জন্য আমাদের জনকয়েক লোক অন্য দিকে স'রে গেছে। গুণ্ডা শুধু রয়েছে আমার কাছাকাছি। সব কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার দরকার নেই বাবুজী, সেদিনকার কথা মনে ক'রতেও শিউরে উঠতে হয়। আমি এগিয়ে গেয়ে গেলে কী হয়,

'গুণ্ডা'র 'কুম্‌কী'টাই একটা দাঁতালকে ধরেছিল প্রথমে। বুনো দাঁতালটা 'কুম্‌কী'র পিছনে পিছনে ছুটে আসছে, আর আমরা আশে-পাশে হুঁসিয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় 'গুণ্ডা' তার সেই অপমানের 'বদ্‌লা' নিলো। আমি জানতাম মুখে আমাকে ও 'দোস্ত' বললেও ভিতরে ভিতরে ওর দুষমনী সমানই বজায় আছে। হঠাৎ ও করলো কী—'কুম্‌কী'টাকে ঘুরিয়ে এনে জুবেদার গা ঘেঁসে চালান ক'রে দিলো। দাঁতালটা জুবেদার কাছ-বরাবর এসে সেই 'কুমকী'টাকে আর দেখতে পেলো না, পেলো জুবেদাকে। আমি ব্যাপারটা এক লহমাতেই বুঝে ফেলেছিলাম। বুঝে, জুবেদার মুখ ঘুরিয়ে বনের পথে ছুটিয়ে দিলাম। ছুটিয়ে দিলাম 'খেদা'র দিকে। বুনো দাঁতালটাও পাগলের মতো আসতে লাগলো আমাদের পিছনে পিছনে।

মন তখন আমার খুশীতে ভরা। জুবেদার গলায় হাত দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম,—সাবাস্ জুবেদা!

ঠিক এই সময় মাহুতদের ভয়ানক হুঁসিয়ার থাকতে হয়। আমি জানি 'রফিক চাচা' কিম্বা গুণ্ডা নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে, তবু মুখ ফিরিয়ে গুণ্ডাকে দেখতে চেষ্টা ক'রতে লাগলাম। ভিতরে ভিতরে এ-ইচ্ছাটাও ছিল যে, গুণ্ডা দেখুক, সে আমাকে বিপদে ফেলবার কোশিস্ করলেও, বিপদ আমি এক লহমায় কাটিয়ে উঠেছি!

কিন্তু বাবুজী, জি্‌ন্দগীতে 'নসীব'ই হচ্ছে সব থেকে বড়ো কথা। বেড়াজালের মধ্যে দাঁতালটাকে নিয়ে এসেছি, তার একপাশে গুণ্ডা, অন্য পাশে আমি,—দু'দিক থেকে দু'জনে দুই 'কুম্‌কী' দিয়ে যাকে বলে 'ঠেসে ধরা', তাই ধরেছি,—নিয়ম মাফিক একজনকে এইবার নীচে নেমে এসে দাঁতালটার পায়ে শক্ত দড়ির ফাঁস পরাতে হবে,—কী মনে ক'রে আমিই নেমে এলাম জুবেদার ঘাড় থেকে। কে যেন হেঁকে বললে,—'হুঁসিয়ার!'

হুঁসিয়ারই আমি ছিলাম। দাঁতালটার পিছনের একটা পায়ে

দড়ির ফাঁসটা কৌশলে পরিয়ে দিয়ে সরে আসছি,—এমন সময়, কী যে হলো জুবেদার—বোধ হয় জওয়ানী 'কুম্‌কী' সেবার অপরকে বশ করতে গিয়ে নিজেই পড়ে গিয়েছিল তার বশে! হঠাৎ জুবেদা ঘুরে গেল। গিয়ে, দাঁতলটার গায়ে গা ঘষতে এলো,—আর, সঙ্গে সঙ্গে আমি প'ড়ে গেলাম ওর পায়ের তলায়। নতুন হাতীটার নয়—আমারই অতি আদরের—আমারই নিত্য দিনের সঙ্গিনী জুবেদার পায়ের তলায়।

বাবুজী, মাথার ওপরে বাজ পড়লে কেমন হয় জানি না, তবে মনে মনে একটা আন্দাজ তো করতে পারি, আসমান-জোড়া 'বিজ্‌লী' শরীরটাকে ছুঁলে কীরকম হয়! আমার সেদিন প্রথমেই মনে হয়েছিল, আস্‌মান-জোড়া 'বিজ্‌লী' এসে আমার শরীরের সব হাড়, সব শিরা-উপশিরা টেনে ছিঁড়ে দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে দিয়ে গেছে! মনে হলো, কানের কাছে যেন হাজার-হাজার দামামা বেজে উঠলো, নাক মুখ যেন নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো, শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেল, আর বাঁ-পাটা যেন হঠাৎ গলে গিয়ে জল হয়ে গেল! অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও মনে হচ্ছিল, আমার শরীর বোধ হয় মস্ত বড়ো একটা বরফের চাঁই ছিল, সেঠা হঠাৎ বুঝি 'বিজলী' লেগে গলে জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! হাতীদের চীৎকার শুনলাম, গুণ্ডা এসে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়ে দিলো, রফিক চাচাও চেঁচিয়ে কী যেন বলতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে বনের গাছপালায় একটা ঝড় জাগলো, 'হাড়ে-হাড়ে-কাঁপন-লাগা'র মতো কী-এক ধরনের শীত এসে আমাকে গাছের পাতার মতোই থরথর ক'রে কাঁপাতে লাগলো!

আমার তখন জ্ঞান ছিল না বললেই চলে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সেদিন সব হারিয়েও কিছু একটা যেন জেগে ছিল! সেই 'কিছু একটা' ভাব দিয়েই আমি অনুভব করছিলাম, জুবেদার 'চমক্‌' ততক্ষণে ভেঙে গেছে, জুবেদা বুঝতে পেরেছে, কী এক দুর্ঘটনা সে বুঝি ঘটিয়ে

ফেলেছে। তাই, আমাকে যখন সবাই ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন জুবেদার সে কী আর্ত চীৎকার! সে যেন বলতে চায়,—কী হয়েছে তোমার? তুমি কি ম'রে গেছো? তোমাকে শেষ পর্যন্ত কি আমিই মেরে ফেললাম?

বিশ্বাস করুন বাবুজী, ওরা নির্বোধ পশু, ওরা কথা বলতে পারে না। কিন্তু ওদেরও 'দিল্' আছে, ওরাও সব বুঝতে পারে। সেদিন ও চীৎকার করছিল না তো, যেন বুকফাটা কান্নায় সারা বনভূমি মুখর করে তুল্‌ছিল! ওরা তা' বোঝে নি, কিন্তু আমি তো সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, আমার জুবেদা আমাকে কী কথা বলতে চাইছে!

কাছের শহর 'গুডালুর'ই—এই 'গুডালুর'-এর হাসপাতালে; আমাকে থাকতে হয়েছিল অনেক দিন। অনেক দিন শুয়ে ছিলাম একটা লাল কম্বল ঢাকা দেওয়া লোহার খাটে। মাথার কাছে ছিল জানালা। সেই জানালা দিয়ে একটা নিমগাছের দিকে তাকিয়ে থামতাম। বৃষ্টি হয়ে গেলে নিমফুলের গন্ধ পাওয়া যেতো। ভিজে মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে ভিজে নিমফুলের গন্ধ এসে মনটাকে যেন একেবারে মাতিয়ে তুলতো। রফিক-চাচার মতো গান যদি গাইতে পারতাম বাবুজী, তাহলে দিনরাত আমি গানই গাইতাম!

রফিক চাচা 'মেওয়া' নিয়ে আমাকে দেখতে আসতো মাঝে মাঝে। বলতো,—গুণ্ডা তোর জন্য কাঁদে!

—গুণ্ডা!

চাচা বলতো,—গুণ্ডার মনে বড়ো আফশোস হয়েছে। সে বলে, তার জন্যই তোর এই বিপদটা ঘটেছে!

প্রথম কয়েকটা দিন—অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাট্‌লো বাবুজী।

সে যন্ত্রণার কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না। দেহের যন্ত্রণা ততটা পেতাম না, যতোটা পেতাম মনের যন্ত্রণা। বাবুজী, পরে আমি শুনেছি, আমি নাকি কয়েকটা দিন হাসপাতালে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। 'অজ্ঞান' অবস্থাটা যে কী, তা' ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু, সব সময়ই মনে হতো,—মাকড়শার জালের মতো একটা জাল চোখের ওপরে ভাসছে, কখনো-বা জালটা স্থির হয়ে আছে, কখনো-বা বন্‌বন্ করে ঘুরছে! যখন ওটা বন্‌বন্ করে ঘুরতো, তখন মনে হতো, যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করে উঠ্‌তে চাইছি, অথচ পারছি না! গলার স্বর যেন আমার গলার স্বর নয়, হাত-পা যেন আমার হাত-পা নয়, এমন কি, যে-চোখজোড়া দিয়ে জাল দেখছি, সে-চোখও আমার চোখ নয়!

এর পরে কয়েকটা দিন হলো কী বাবুজী, আমার বিছানার আশেপাশে নানান রকম লোকের ভীড় দেখতাম সব সময়। তাদের কাউকে আবছা-আবছা চেনা-চেনা মনে হয়, অথচ, ঠিক চিনতে পারি না। এক-একদিন তাদের দেখে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠতে চাইতাম! কিন্তু, কে শুনবে আমার চীৎকার? আমার গলা আর আমার বশ মান্‌ছে না! অথচ, আমার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে তখন, মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল! ধবধবে সাদা তাদের হাত-পা-বুকের পাঁজরা—মাথা—মুখ—আর সারি সারি দাঁতের পাটি!

তারপরে একদিন দেখলাম বাবুজী, বিছানার একদিকে বুড়োর দল, অন্যদিকে কচি-কচি শিশুরা সব হাসছে—খেলছে—ছুটোছুটি করছে! কে যেন ঠিক তখনি আমার কানে-কানে ব'ললে বুড়োদের দেখিয়ে,—এরা সব ছিলেন, এখন নেই।

আর তারপরেই শিশুদের দেখিয়ে,—এরা সব আসবে, এখন নেই।

জ্ঞান যেদিন প্রথম ফিরে এলো, সেদিন চোখ খুলে কাকে প্রথম দেখেছিলাম, জানেন বাবুজী? মুন্নীকে। আকাশের-ভরা চাঁদের

মতোই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি, মনে হচ্ছিল, খোয়াব দেখ্‌ছি বুঝি।

ও ব'ললে—বাড়ী যাবে কবে? আমার আর ভালো লাগছে না!

কিন্তু যাবো কী ক'রে? আমার পা? হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার একটা-পা নেই। হাঁটুর ওপর থেকে একটা কাটা প'ড়েছে। যেটুকু আছে, সেটুকু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে ডাক্তার সাহেবরা। নাড়াতে পারছি না, দারুণ যন্ত্রণা!

ছেলেমানুষের মতো 'হায়-হায়' ক'রে আমি ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলাম সেদিন। একটা পা নেই, বাকী একপায়ে আমি চলবো কী ক'রে? কাজকর্ম করবো কেমন ক'রে? জুবেদার ঘাড়ে উঠে বনের পথে যে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো,—তা আর আমি পারবো কী ক'রে?

কেউ আমাকে সেদিন শান্ত করতে পারে নি বাবুজী, মুন্নীও না। ডাক্তার সাহেব এসে আমাকে একটা ইন্‌জেক্‌সান দিলেন, কী একটা বড়ি ওষুধও দিলেন, আর তারপরেই আমার কথা আস্তে আস্তে জড়িয়ে আসতে লাগলো, চোখ আপনিই বুজে গেল, আর মনে হলো, বহুদূরে—কোন্ বন থেকে যেন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসছে,—একটানা!

একদিন-দুদিন নয়, এমন কি একমাস-দু'মাসও নয়, ছয় কি সাত মাস একই ভাবে আমাকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল বাবুজী! মুন্নী প্রায়ই আসতো আমাকে দেখতে রফিক-চাচার সঙ্গে। কম রাস্তা নয় বাবুজী, মেয়েছেলে হুট্ ক'রে আসেই বা কেমন করে? সুবিধা মতো লরী-টরী পেলে তবেই তো আসা! রফিক চাচা সর্দার মানুষ, তাই রফিক চাচা নইলে লরীর সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়।

একদিন, কী আশ্চর্য! আপ্পানা এলো দেখা করতে। একটু দূরেই সে বসলো মেঝের ওপর। বললে,—গুণ্ডা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, পারে না।

—কেন ?

বললে—একদিন পায়ে হেঁটে এসেওছিল শহরে, হাসপাতালের কাছ-বরাবর এসে ফিরে গেছে। বলে, আব্বাসী ভাইকে আমি মুখ দেখাবো কেমন ক'রে ?

চুপ করে রইলাম। তারপরে এক সময় বললাম,—ডাকবাংলোয় এখন কেউ আছে রে ?

আপ্পানা কী যেন ভাবছিল মাথা হেঁট করে। বললে,—না।

ডাকলাম,—আপ্পানা ?

—কী ?

—কাছে আয়।

এলো। ব'ললাম,—সবার কথাই তোরা বলিস, একজনের কথা কেন বলিস না ?

—কে একজন ?

ব'ললাম,—জুবেদা।

আপ্পানা কোনো উত্তর না দিয়ে সরে গেল কাছ থেকে। চেঁচিয়ে ডাকলাম,—আপ্পানা ?

আপ্পানা সাড়া দিলো না। আমার চীৎকারে বিরক্ত হয়ে, আশে-পাশের রোগীদের যারা তখন দেখতে এসেছিল, তারা মুখ ফিরিয়ে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু।

আমার মনের ভিতরে তখন ঝড় উঠেছে,—বেঁচে আছে তো ? বেঁচে আছে তো আমার জুবেদা !

পরে যেদিন মুন্নী এলো রফিক চাচার সঙ্গে, সেদিন প্রথম কথাই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম,—জুবেদা কোথায় ?

আপ্পানার মতো মুন্নীও কোনো কথা বললো না, কথা বললো না রফিক চাচাও।

মুন্নীর হাতটা ধ'রে ব্যাকুল হয়ে ব'লে উঠলাম,—চুপ করে থাকিস

না, আমায় বল্! তাকে ওরা মেরে ফেলেছে, না, তাড়িয়ে দিয়েছে?

মুন্নী ধীরে ধীরে বললে,—মেরেও ফেলেনি, কেউ তাড়িয়েও দেয়নি।

—তবে?

মুন্নী বললে—পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল!

মুন্নী বললে—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছে। একদিন পায়ের শেকল ছিঁড়ে ছুটে এসেছে আমাদের কুঁড়েঘরে, বাতা থেকে শুঁড় দিয়ে তোমার সেই লাটাইটা বার করে নিয়েছে, আর 'বাউরা'র মতো জঙ্গলে তোমাকে ডেকে ডেকে ফিরছে!

শুনতে-শুনতে আমার চোখদু'টো জলে ভ'রে এলো। আমি যেন গুডালুরের সেই হাসপাতালে শুয়ে-শুয়েও ওর সেই ডাক শুনতে পেলাম। ও যেন কেঁদে কেঁদে বলছে,—কোথায় তুমি? আমাকে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখো?

আমি আর থাকতে পারলাম না বাবুজী, কেঁদে রফিক চাচাকে বললাম,—চাচা, আমাকে এরা কবে ছেড়ে দেবে?

—ভালো হয়ে ওঠো, তারপর।

—ভালো হইনি?

—কোথায় ভালো হ'য়েছো?

বলার কিছু নেই। আমার জীবনটা যেন আর আমার হাতে নেই, পরের হাতে চলে গেছে।

আরেকদিন। মুন্নীরা আসতে শুনলাম,—ওকে আর 'খেদা'য় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় না। ও বাউরা,—অন্য হাতীকে ও'আর বশ করতেও পারে না।

এরও পরে আরেকদিন। শুনলাম, শেকল ছিঁড়ে ও জঙ্গলে

পালিয়ে গেছে। কিন্তু, পালিয়ে গেলে হবে কী, আশ-পাশ থেকে প্রায়ই ওর ডাক শুনতে পায় মানুষ।

মুন্নী বলে,—সেই ডাক শুনি, আর আমার বুকটা ভয়ে কাঁপে।

—কেন? ভয় কীসের?

মুন্নী বলে,—বাউরা হাতি, ভয় করবো না ওকে? কাকে এসে জানে মেরে দেবে, কে জানে! আমার ওপর রাগ ছিল, হয়তো আমাকেই—

কথাটা শেষ করে না মুন্নী, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সান্ত্বনা দিয়ে বলি,—ভয় নেই, ও তোর কিছু ক'রবে না। কিন্তু, হঠাৎ ও 'বাউরা' হয়ে গেল কেন, ভেবে দেখেছিস্?

মুন্নী মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু, কিছু বলে না।

এর দিন কয়েক পরে আসেন রফিক চাচা একা। ব'ললাম,—মুন্নী?

—আসতে পারেনি। তবিয়ৎ খারাপ।

চম্‌কে উঠে বললাম,—জুবেদা এসে ওর কিছু করে নি তো?

—না-না তা' কেন!—রফিক চাচা বললে,—বাপ-বেটিতে কী নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছে, তা ছাড়া শরীরটাও ভালো নেই, ব'ললাম—থাক বেটী, আজ আমি একাই যাই।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। তারপরে বললাম,—চাচা!

—কী?

—জঙ্গলের খবর কী?

চাচা বললে—খেদায় একটা বাচ্চা হাতি ধরা পড়েছে সেদিন। মাদী। ভালো 'কুম্‌কী' হবে পরে।

ব'ললাম—জুবেদার খবর কী

—জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরছে। ডাক শুনতে পাই মাঝে মাঝে।

—ওকে ফেরানো যায় না?

—কে ফেরাবে?—চাচা বললে,—সবাই বলে, ডাকাতে হাতি, কাকে আবার পায়ের চাপে শেষ ক'রবে কে জানে। তোর নসীব ভালো, তুই জানে বেঁচে গেছিস আব্বাসী।

চুপ করে রইলাম। নিমগাছে হাওয়া লেগে নিমফলগুলি টুপ্‌টাপ্‌ ঝ'রে পড়ছে। জানালা থেকে বেশ দেখা যায় ছোট-ছোট ফলগুলোকে!

মুখখানা ফিরিয়ে আবার দেখতে লাগলাম চাচাকে। যেন আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে চাচা, যেন আরও চুপচাপ।

বললাম,—তোমার গান অনেকদিন শুনিনা চাচা।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে আনলো চাচা, বললো,—আর গান! গান আর গাই না আব্বাসী।

—ঘুড়ি?

—ঘুড়িও আর তৈরি করি না। কী হবে পয়সা রোজগার করে?

বললাম,—আমার কাছ থেকে কতো পয়সাই না তুমি পাও!

চাচা বললে—ছিঁড়ে ফেলেছি রে। হিসেবের খাতা শেষ করে দিয়েছি। কারুরই কাছ থেকে কিছু পাই না। দীন মহম্মদ সাহেব চলে যাবার পর তার কাজ আমার ওপরেই এসে পড়লো। কিন্তু কে আছে আমার, কার জন্য কী করবো বল্? আমরা সব বাউণ্ডুলে, শহর-থেকে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলে এসে পড়েছিলাম। সেই থেকে জঙ্গলেই পড়ে আছি। দীন মহম্মদ সাহেব যেমন করে চলে গেছে, আমাকেও তেমনি করে চলে যেতে হবে!

দীন সাহেবের কথায় বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখের কোণও ভ'রে উঠলো জলে।

বললাম,—চাচা?

—কী?

বললাম,—সেই চন্দন-বনের কাহিনী কিন্তু আমাকে তুমি আজও বললে না! সেই যে দীন সাহেব শেষ সময়ে তোমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন?

রফিক-চাচা বললে,—হ্যাঁ, সে আমাদের সবার শেষের গল্পই বটে। শুন্‌বি তুই? সে অনেক কালের কথা। দেশের রাজা শিকার করতে এসে আমাদের ঐ জঙ্গলের কাছেই পথ হারিয়ে ফেললেন। শেষে এমন হলো, ঘোড়া নিয়েও আর চলতে পারেন না। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে একাই হেঁটে হেঁটে চলতে লাগলেন। যেমন 'ভুখ্' লেগেছে, তেমনি তেষ্টা পেয়েছে। ঘুরে-ঘুরে অবসন্ন। সেই গহীন জঙ্গলে কোথায়—কে? অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে দেখেন, ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। ঘন বনের মধ্যে কুঁড়ে বানিয়ে এমন করে বসবাস করছে কে? রাজা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মাঝারী বয়সের লোক। চেহারা আর পরণের কাপড় দেখেই বোঝা যায়, লোকটি কতো গরীব। রাজাকে সে চিনতে পারে নি, রাজাও পরিচয় দেন নি। লোকটি তাকে দাওয়ায় বসিয়ে ঘর থেকে জল আর শুক্‌নো গোটা দুই রুটি এনে দিলো। রাজার কাছে তখন তাই যথেষ্ট। খেয়ে, সুস্থ হয়ে রাজা বললেন—তুমি কে?

সে বললে—আমার নাম রঘুয়া। আমি এই বনের এক কাঠুরে। কাঠ-কাঠরা কুড়িয়ে, কি শুক্‌নো ডালপালা কেটে, সেগুলো পুড়িয়ে কাঠকয়লা তৈরি করি। তারপরে সেই কাঠকয়লা নিয়ে যাই বস্তা করে শহরে। কিন্তু সামান্য কাঠকয়লা বেচে আর কতোটুকু আয় হয় বলুন? আমি বা আমার পরিবারের দুবেলা পেটটুকুও ভরে না।

রাজা তখন পরিচয় দিলেন নিজের। বললেন—আমার সঙ্গে শহরে গিয়ে দেখা করবে। অসময়ে জল দিয়ে আমার তেষ্টা

মিটিয়েছো, আমি তার জন্য তোমাকে এমন-কিছু দেবো রঘুয়া, যাতে তোমার দুঃখ ঘুচে যায়।

রঘুয়া রাজাকে সেদিন শুধু জলই দেয়নি, পথ দেখিয়ে বনের বাইরেও নিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় রাজা বললেন,—আসবে ত ?

—আসব।

রঘুয়া কিন্তু সত্যি সত্যি গিয়েছিল শহরে। রাজার দারোয়ান কি সহজে ঢুকতে দেয় ? অনেক কষ্টে রাজার দেখা পেলো রঘুয়া। রাজা খুসি হলেন। আর খুসি হয়ে করলেন কী জানিস ? সোনা-দানা না দিয়ে,—কাঠুরের মনের মতো হবে ভেবে, তাঁর বিশাল চন্দন বনগুলোর একটা বনই তাকে দিয়ে দিলেন। ভাবলেন, চন্দন কাঠ বিক্রী করে রঘুয়ার দিন বেশ ভালই কেটে যাবে।

তারপরে কেটে গেল প্রায় দশটি বছর। রাজার কী মনে হলো, —তিনি একদিন বেরিয়ে পড়লেন বনের দিকে—রঘুয়াকে দেখতে। রঘুয়া তখন চন্দন বনেই এসে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু, বনের মধ্যে রাজা এসে হক্‌চকিয়ে গেলেন। সেই বড়ো-বড়ো বিশাল গাছগুলো সব গেল কোথায় ? সব শূন্য, মাত্র দুটো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আর এধারে-ওধারে কাঠকয়লা পড়ে আছে। রঘুয়াকে ডেকে পাঠালেন রাজা। জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—করেছ কী তুমি ?

রঘুয়া রাজাকে সেলাম করে বললে,—কেন মহারাজ, খারাপ কী করেছি ? আপনার দয়াতে খেয়েপ'রে বেঁচে আছি।

—বড়ো বড়ো সব গাছগুলো কী হলো ? এখানে-সেখানে কাঠ-কয়লা পড়ে আছে কেন ?

রঘুয়া বললে,—কাঠ কেটে আমি কয়লা করেছি মহারাজ। কয়লা বিক্রি করেই ত' আমার দিন চলে।

রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। রঘুয়া কাঠকয়লাই চিনেছে, চন্দন কাঠের মূল্য কতো তা' তো আর জানেনা !

রাজা ব'ললেন—কয়েক টুক্‌রো কাঠ নিয়ে এক্ষুনি তুমি শহরে চলে যাও। আমি ততক্ষণ বসে আছি এখানে। বিক্রি ক'রে কতো পাও, এনে আমাকে দেখাবে।

রঘুয়া কাঠকয়লার ব্যাপারী, এমনি কাঠের মূল্য সে বোঝে না। শহরে কাঠের টুক্‌রা নিয়ে যেতেই কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। সামান্য কাঠ বিক্রি করে রঘুয়া নিয়ে এলো কুড়িটা টাকা। আর এই টাকা হাতে পেতেই তার টনক ন'ড়লো! সে এসে রাজার পায়ে কেঁদে পড়লো। বললো,—হায় হায় করেছি কী? এ-কাঠের মূল্য যে এতো, তা'ত আমি জানতাম না! আমি কিনা কাঠগুলোকে কয়লা করে বিক্রি করে এসেছি জলের দামে!

রাজা বললেন—এখনো তোমার দু'তিনটি গাছ আছে। এইবার ত বুঝেছো, এ-গাছের কী মু'ল্য? সাবধানে চলো, তোমার অবস্থা ভালই হবে, খারাপ হবে না।

রাজা চলে গেলেন। আর তারপরে রাজার উপদেশ শুনে রঘুয়ার দিন সুখেই কাটতে লাগলো।

থামলো রফিক-চাচা। ততক্ষণে হাসপাতালের ঘণ্টা বেজে উঠছে, চাচাকে এখুনি চলে যেতে হবে। চাচা উঠে দাঁড়ালোও। তারপরে কী ভেবে একেবারে কাছে এসে বলতে লাগলো,-আসল কথাটা কী জানিস? আমাদের এই জীবনটা—জীবন কেন—শরীরটাকেও ধরতে পারিস, এটা হচ্ছে ঠিক ঐ চন্দন-গাছের মতো। জীবনের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস ঐ চন্দন গাছের হাওয়ার মতো। খোদাতাল্লা ঐ রাজার মতোই আসেন আমাদের কাছে, ঐ রাজার মতোই চন্দন-বন দান করে যান আমাদের। তন্দুরস্তি, সুখ আর ধনদৌলতই হচ্ছে এই চন্দন-গাছের মূল্য। কিন্তু, আমরা কি তা' বুঝি? আমরা সবাই মুর্খ কাঠুরে রঘুয়ার মতো আমাদের জীবনগুলোকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে কয়লার মতো জলের

দামে বিকিয়ে দিচ্ছি। দীনসাহেবের 'অন্তেকালে' এই কহানীটাই তিনি শুনতে চেয়েছিলেন কেন, এইবার ভেবে দ্যাখ্। সময় হয়ে গেছে, আমি চলি।

চলে গেলেন। দরজার বাইরে চাচার দেহটা মিলিয়ে গেল। আর দেখা গেল না তাঁকে, কিন্তু যে চিন্তা রেখে গেলেন আমার মনে, তা' যেন কেটে কেটে বসে যেতে লাগলো মনের মধ্যে। স্বাস্থ্য, সুখ আর ধনদৌলত হচ্ছে জীবনরূপ চন্দনগাছের মূল্য। আমরা তা বুঝিনা ব'লে জলের দরে বিক্রি করে ফেল্‌ছি।

যাই হোক, আমার কথায় আমি আবার ফিরে আসি বাবুজী। ছ'সাত মাস পরে একদিন শেষ পর্যন্ত আমি ছুটি পেলাম হাসপাতাল থেকে। আমাকে আনতে গিয়েছিল মুন্নী আর রফিক চাচা। কাঠের ক্রাচ্ নিয়ে চলাফেরা করতে হয় আমাকে। মুন্নীকে বললাম,—তাহলে, আমি বেঁচেই গেলাম, কী বলো? ও আমার একটা হাত ধ'রে ছিল, কোন কথা বললো না, মুখখানা নীচু করলো শুধু।

চাচাকে ব'ললাম—যাবো কীসে চাচা?

চাচা বললে—একটুখানি কষ্ট করে হাঁট্। একটা লরী যাবে জঙ্গলে। সেই লরীতে তুই যাবি। তুই আর মুন্নী বসবি ড্রাইভারের পাশে, আমি থাকবো ওপরে।

বললাম—কী বলছ তুমি! তুমি বুড়ো মানুষ, তুমি থাকবে ওপরে, একা?

হাসলো রফিক-চাচা, বললে—একা কেন! সঙ্গে আরও একজন থাকবে।

—কে?

রফিক চাচা বললো,—গুণ্ডা।

—গুণ্ডা!—বলে উঠলাম,—কোথায় সে!

—লরীতে বসে আছে।

গেলাম। মুখে দাড়িগোঁফ, জংলীর মতো চেহারা হয়েছে। দূর থেকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম,—গুণ্ডা!

ফিরে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলো না। কাছে গিয়ে যখন দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তখন আর থাকতে পারলো না, আমাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রলো দুটি হাতে। ধরা গলায় কোন রকমে বললে,—একী চেহারা হয়ে গেছে তোমার, আব্বাসী!

—বেঁচে তো আছি।

ও বললে—কতদিন এসে ফিরে গেছি, দেখা দিতে পারিনি। আমার দোষেই তোমার এ অবস্থা।

বল্‌লাম,—না ভাই, আমার নসীব।

লরী ড্রাইভার হর্ণ দিয়ে তাড়া দিলো। মুন্নী আমাকে নিয়ে উঠলো সামনে, চাচাকে নিয়ে গুণ্ডা উঠলো পিছনে। লরী আপাততঃ খালি, কিন্তু যখন ফিরবে, তখন থাকবে একেবারে ভর্তি। কী ভ'রে আনবে লরী, চন্দন কাঠ, না এমনি কাঠ? না, কাঠ কয়লা?

কথাটা মনে হ'তেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠে থাকবে। মুন্নী সেটা লক্ষ্য করেছিল, বললে—হাসছ যে?

বলে উঠলাম,—হাসবো না! কতদিন পরে সব-কিছু দেখছি!

যাই হোক, অনেকদিন পরেই ফিরে এলাম ঘরে। একে একে এসে দেখা করে গেল সবাই! আমার একটি পা নেই, কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে-দিয়ে উঠে-হেঁটে বেড়াই। তবিয়ৎ ভালো নেই, বেশ দুর্বল এখনো। সবই ঠিক আগের মতো, কিন্তু কেমন যেন সেই সুরটি আর নেই। বাঁশীটা পড়ে আছে, কিন্তু সুর ওঠে না তাতে, সুর তোলার কেউ নেই ব'লে।

কিন্তু, তাজ্জবের কথা বাবুজী, গহীন জঙ্গলে কে গিয়ে জুবেদার

কানে-কানে বলে এলো, আমি এসেছি—কী করে জুবেদা টের পেলো যে, আমি আবার ফিরে এসেছি আমার ঘরে ?

সেদিন বিকেলবেলা, দাওয়ায় বসে গল্প করছি মুন্নীর সঙ্গে, এমন সময় হঠাৎ এসে হাজির হোলো জুবেদা। বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে, পাগলের মতোই দেখতে হয়েছে ওকে। কে ওর দেখ-ভাল্ করে বাবুজী ? কে ওকে খাওয়ায় ? বাউরা মানুষকেই লোকে দূর-দূর করে, আর, এ তো অবোধ একটা জীব! আমাকে দূর থেকে দেখেই ছুটতে ছুট্তে কাছে এলো। মুন্নী ওর ছুটে আসার ধরণ দেখেই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

জুবেদা কাছে এসে থম্কে দাঁড়ালো, তারপরে করলো কী,—শুঁড় দিয়ে বাতা থেকে বার করলো আমার সেই লাটাইটা। তারপরে—ঠিক আগের মতো সুর করে ডেকে উঠলো। তার মানে হলো কী ? না,—এসেছো যখন, এবার চলো ? ঘুড়ি ওড়াবে চলো ? আমাকে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখবে চলো ?

আমার চোখের কোণ ভিজে উঠেছে, বুকে ঠেলে ঠেলে কেবল কান্না আসতে চাইছে। ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। আর ও' করলো কী, একটু পিছিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো আমাকে। আমার ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটবার ধরন দেখে কান দুটো খাড়া করলো।

আমি দাওয়া থেকে নেমে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো মুন্নী,—না-না, যেওনা, ওটা পাগল হয়ে গেছে, তোমাকে মেরে ফেলবে!

শুনলাম না বারণ, ওর কাছে গিয়ে ওকে আদর করতে লাগলাম গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। আরামে ও' চোখ বুজলো। ডাকলাম—জুবেদা ?

খুশী হয়ে সাড়া দিলো। বললাম,—পাগল হয়ে গেছিস ? কেন ?

আমাকে না দেখতে পেয়ে? 'আমার গায়ে পায়ের চাপ দিয়ে পা-টা ভেঙে দিয়েছিলি বলে? পা গেছে—যাক। তোর কি দোষ? তোর বয়সের ধরম তোর 'দেমাগ' খারাপ করে দিয়েছিল। তোর বয়সের ধরমে দাঁতাল হাতীটার গায়ে গা ঘষ্‌তে গিয়েছিলি তুই। তোর কি অপরাধ? কিন্তু সেটা তুই বুঝলি না, আমাকে মেরে ফেলেছিস মনে করে বাউরা হয়ে গেলি?

চুপ করে যেন আমার কথাগুলো শুনতে লাগলো জুবেদা। মুন্নী এসে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল!

আমি চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিলাম। কিন্তু খোঁড়া পায়ে কোথায় আর যাবো? আমাদেরই বাড়ীর সীমানায় যে বেড়া দেওয়া ছিল জঙ্গল ঘেঁষে,—সেই বেড়ারই একটা খুঁটির সঙ্গে ওকে ঠিক আগের মতোই বেঁধে রাখলাম লাটাইয়ের পুরানো পচা সুতো দিয়ে। আর তাজ্জবের ব্যাপার, যেমন করে ও' বাঁধা থেকে শুঁড় দোলাতো, ঠিক তেমনি করে জুবেদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ওর গা ঘেঁষে ওকে আদর করতে করতে ভাবতে লাগলাম,— কে বলে জুবেদা পাগল হয়ে গেছে? না-না, ওরা ওকে বুঝতেই পারে নি।

সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তেই সুতোর বাঁধন খুলে দিলাম ওর। তারপরে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম,—যা, এবার ফিরে যা হাতিশালায়।

পরদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম, সত্যিই ও' ফিরে গিয়েছিল হাতিশালায়।

গুণ্ডা এসে বললে,—তুমি কি যাদু জানো? জুবেদা আগের মতোই ভালো হয়ে গেছে আবার।

কয়েকটা দিন ভালোই কাটলো। কিন্তু আশ্চর্য, খেদার সময় খেদা'য় ও' কিছুতেই গেল না। কতো টানাটানি করলো ওরা, কিন্তু গোঁয়ারের মত এমন শক্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো যে,

কিছুতেই নড়ানো গেল না। শেষ পর্যন্ত আমাকে ওরা ডেকে নিয়ে গেল। আমি কতো আদর করলাম, অবশেষ ধমকালামও। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বুঝতে পেরেছে যে, খেদায় যাওয়া হচ্ছে। তাই এক তিলও ন'ড়লো না।

'গুণ্ডা' কেন, রেগে গিয়ে রফিক চাচা নিজেই ওকে ডাঁশ মারতে লাগলো। 'ডাঁশ' মেরে মেরে শেষপর্যন্ত ওকে নড়াতে পারা গেল বটে, কিন্তু ও' খেদার দিকে গেল না, ছুটে গেল জঙ্গলে—অন্যদিকে।

চাচা ডাঁশ ফেলে দিয়ে ব'ললো,—আব্বাসী, শোন।

কাছে গেলাম। চাচা কপালের ঘাম মুছে ফেলে ব'লতে লাগলো,—কী, বলিনি তোমাকে? ও' নির্ঘাৎ 'বাউরা' হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে আর 'কুম্‌কীর' কাজ চলবে না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভার-ভার মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। মুন্নী বললে—হলো কী?

বললাম, জুবেদা খেদায় গেল না, জঙ্গলে পালিয়ে গেল। ওরা ডাঁশ মেরেছে, খোঁচা খেয়ে রক্ত বেরিয়েছে গা থেকে,—ও' আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু পরদিন, বিকেল হতে-না-হতেই, হঠাৎ একসময় শুনলাম সেই অতি পরিচিত ডাক। দেখি, জুবেদা জঙ্গলের দিক থেকে হেলতে-দুলতে ধীরে ধীরে কাছে আসছে।

ভিতরটা যেন খুশীতে চুরমার হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলাম,—জুবেদা!

জুবেদা ঠিক আগেকার মতোই কাছে এলো, ঘরের চালের বাতায় যেখানে লাটাই থাকে, সেদিকটায় স'রে গেল, শুঁড় দিয়ে লাটাইটা বার ক'রে আমার কাছে ফিরে এলো। আমি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর গায়ে ঘা হলো কি না দেখ্‌ছি, ও' কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি বুঝলাম ব্যাপারটা। তাই শুরু হলো আবার সেই 'সুতো দিয়ে বেঁধে

রাখার' খেলা! অবোধ জানোয়ার এ-খেলায় কী যে আনন্দ পায়, কে জানে! আনন্দ আমিও কী কম পেতাম বাবুজী? কিন্তু সাঁঝ ঘনিয়ে আসতে-না-আসতেই যখন ওকে ছেড়ে দিলাম, তখন, তাকিয়ে দেখি, ও হাতিশালার দিকে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অন্য দিকে।

চীৎকার ক'রে ডাকলাম,—জুবেদা!

একবার থম্‌কে দাঁড়ালো, কান তুটো খাড়া ক'রে শুনলো আমার কথা, কিন্তু, পাছে আমি আরও ডাকি, পাছে আমার ডাক শুনে নিজের মনটা নরম হয়, তাই তাড়াতাড়ি বুনো হাতির মতো জঙ্গলের ভিতরে ছুটে চলে গেল।

পরদিন ক্রাচ্-এর সাহায্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেলাম হাতি-শালায়। রফিক-চাচা বাইরে একটা মোড়ার ওপর ব'সেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে,—কী রে আব্বাসী?

বললাম,—জুবেদা হাতিশালায় আসে না?

—না।

ফিরে এলাম। বিকেলে, যেমন হেলতে-তুলতে আসে, তেমনি এলো জুবেদা। আদর করে বললাম,—সাঁঝ হয়ে গেলে যখন ছেড়ে দেবো, তখন হাতিশালায় ফিরে যাস্—কেমন? জঙ্গলে যাস না, জঙ্গলে থাক্‌তে থাক্‌তে আবার বুনো হয়ে যাবি।

কিন্তু, কে শোনে কার কথা? ঠিক আবার চলে গেল জঙ্গলে।

পরদিনও গেলাম হাতিশালায়। গিয়ে দেখি, রাজাবাহাতুরের আমিন এসেছে, মুন্‌শী এসেছে, পাইক-পেয়াদা এসেছে। মাসে একবার-তুবার ক'রে ওরা আসে। খিদ্‌মদ্‌গারদের মাইনে দেওয়া, হাতিশালার খরচ,—এইসব নানান্ ব্যাপার। মুন্‌শীজী আমার হাতে কোনো 'মাইনে' তুলে দিলো না। রফিক-চাচা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে গেল ব্যাপারটায়।

জিজ্ঞাসা করলো,—ও' মাইনে পাবে না?

—না।

—কেন ?

মুন্‌শীজী বললে,—হাসপাতালে প'ড়ে ছিল, কাজ তো করে নি,—তবে ?

আপনি চম্‌কে উঠবেন না বাবুজী, আমাদের সময়ে এই ধরনের ঘটনাই ঘট্‌তো, এখন হয়তো আলাদা রকম কিছু হয়েছে।

যাই হোক, কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চললো ওদের। আমি কোনো কথা বলি নি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শুনলাম,—আমার নোকরীও চলে গেছে। তবে, 'খেদা'র সময়ে পা গেছে বলে, পরে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবেন রাজাবাহাদুর।

রফিক-চাচা বললে,—সে তো পরের কথা, এখন ও' খায় কী মুন্‌শীজী ?

মুন্‌শীজী সে-কথার উত্তর দিলো না, অন্য ধরনরে 'বাৎচিৎ' তুলে কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলো। জিজ্ঞাসা করলো,—জুবেদা যখন হাতিশালায় আসে না, তখন ওর নামে 'দানাপানি' এখনো বরাদ্দ ক'রে রেখেছো কেন ?

'গুণ্ডা' কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—হাতিটা তো রাজাবাহাদুরেরই হাতি, না কী ? ওকে আমরা ঠিক ধরে আনবো।

ওদের কথা-কাটাকাটির মধ্যে আমি আর থাকি নি।

মুন্নী বললে—কী হলো ? মুখ শুক্‌নো যে ?

ধপ্‌ ক'রে দাওয়ার ওপর বসে পড়লাম, বললাম,—নোক্‌রীটা গেছে।

মুন্নী একটুক্ষণ থম্‌কে থেকে তারপর বললে,—আপদ গেছে। ভারী তো নোক্‌রী !

ছুটি ছলোছল চোখ মেলে ওঁর দিকে তাকালাম। ও' কি একবারও বোঝবার চেষ্টা করবে না, আমার ভিতরে এখন কী হচ্ছে ?

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—এই ঘর যদি ছেড়ে দিতে বলে ?

—ঈস্! ছাড়লেই হ'লো! দীন সাহেব নিজের পয়সায় এটা তৈরী করে গেছেন না ?

বললাম,—তা' গেছেন, কিন্তু জমিন্ তো ওদের ?

রাগ ক'রে বললে—জমিন ভগবানের। কে আমাদের তাড়ায় দেখি !

বললাম—সে না হয়, হলো। খাবো কী ?

ও' বললে—তোমাকে ভাবতে হবে না।

বললাম—অবশ্য পা কাটা যাওয়ায় কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

ও বললে—ঐ আশায় বসে থাকো ! কম দেখলাম না এতখানি বয়সে ! ঐ আমীন-মুনশীরাই সে'টাকা পেটে পুরে বসে থাকবে, দেখবে'খন।

মুখে বললাম,—যাঃ ! তাই হয় নাকি ?

কিন্তু মনে মনে কথাটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। কেমন যেন একটা ভয় এসে আমার মনটাকে জুড়ে বসেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরই এটা হয়েছে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে একটা ভয় আমার মনটাকে কুরে কুরে খেতো। মনে হতো, নোকরীটা চলে যাবে না ত' ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম,—যাঃ ! তাই কি হয় নাকি ? দীনসাহেব নেই, রফিক-চাচা তো আছে। কিন্তু তখন ত' বুঝিনি, শহরের আমীন-মুনশী-পাইক-পেয়াদার কাছে রফিক-চাচার ক্ষমতা আর কতটুকু !

হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে আরও ভয় হতো। ভয় হতো,—জুবেদা আমাকে আর চিনতে পারবে না—আমার কাছে আর আসবে না। আরও ভয় হতো,—মুন্নীও হয়তো চলে যাবে।

ধীরে ধীরে তাইতো হ'তে চলেছে বাবুজী। নোকরী চলে গেল, এইবার জুবেদা যাবে। এইবার আমি একা—ছনিয়ার বুকে আমি একেবারে একা থাকবো—কাজকাম করতে পারবো না—লোকের দয়ার ওপরে থাকতে হবে—ভিখিরীর মতো।

কিন্তু সে যাক, যে-কথা বলছিলাম, সেটাই শেষ করি। গুণ্ডা যদিও বলেছিল,—জুবেদাকে ধ'রে আনবে। কিন্তু আমি জানতাম 'বাউরা' হাতিকে ধরে আনা কতো কঠিন ব্যাপার! বুনো হাতির থেকেও শক্ত। তার নিজের 'মর্জি' না হলে তাকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারবে না। বিকেলে ও' এলে আমি ওকে কতো বুঝিয়েছি, ও' যায় নি। 'গুণ্ডা'রা একদিন বিকেলে ওকে বাঁধতে এলো, কিন্তু পারলো না। দূর থেকেই ওদের ফন্দী ও' যেন আন্দাজ পেয়ে যায়। তখন আমার খেলার বাঁধনও ও' আর মানে না, ছুটে চলে যায় জঙ্গলে। কিছুদিনের মধ্যে গুণ্ডারাও হাল ছেড়ে দিলো। 'কুমকী'র কাজ যখন ওকে দিয়ে হবে না, তখন ওকে মিছিমিছি শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেই বা লাভ কী?

রাত কাটে, সকালে কাটে, ছপুর কাটে, বিকেল হলেই জুবেদা আসে। সেই 'সুতো দিয়ে বেঁধে রাখার খেলা' খেলে যায়, আর কোনো কথাই আমার শোনে না, ঠিক জঙ্গলে ফিরে যায়। জঙ্গলে কোথায় থাকে, কী করে, কিছুই জানতে পারি না। বাউরা হাতি, কার ক্ষেতে কোন্‌দিন যে মুখ দেবে, আর হাম্‌লা বাঁধবে, শিকারী আসবে খবর পেয়ে, গুলি ক'রে মেরে ফেলবে,—এই ভয়েই মনটা আমার তখন অস্থির হয়ে উঠ্‌তো! মুন্নী জিজ্ঞাসা করতো,—অতো কী ভাবো বসে বসে?

বলতাম,—বড়ো ভয় করে।

—কীসের ভয়?

বলতাম,—আমীন-মুন্‌শীরা টের পেয়ে গেছে, ওরা যদি শিকারী পাঠিয়ে দেয়?

—কেন ?

বললাম,—হাতী খাউরা হয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলবার নিয়ম আছে যে! তখন মরা হাতীর দামটা পাওয়া যায়। হাতীর দাঁতের দাম, হাড়ের দাম,—বুঝলে না ?

মুন্নী বললে,—ও, তুমি জুবেদার কথা ভাবছো ?

—হ্যাঁ।

মুন্নী আর কিছু বলে না, সংসারের কাজ নিয়ে মেতে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা কেমন যেন 'উদাস' হয়ে গেল! আমি ফিরে আসবার পর থেকে মুন্নীও যে অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে চলেছে! যেদিন থেকে কাটা পা নিয়ে ফিরেছি, ঠিক সেদিন থেকে ওর বাংলোয় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ওর বাপ এসে এক-একদিন কতো খোসামোদ করে গেছে, কতো মিনতি করে গেছে,—তবুও ও' যায়নি।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নজর করে মনটা খুব 'খুশ্' হতো। ওর বাপ এসে তাগাদা দিচ্ছে, 'মিনতি' করছে, দরকার হলে ধম্‌কাচ্ছে, তবুও ও যাচ্ছে না—দাওয়া থেকে ঘরের ভিতর এই 'ব্যাপার'টা দেখছি, আর 'দিল'টা ভ'রে উঠ্‌ছে সরাবের পেয়ালার মতো। অদ্ভুত আরামে ঘুমিয়ে পড়তাম সারা রাতের জন্য। বাবুজী, আপনাকে আর বলবো কী, কতোদিন যে ও রকম ঘুম আমি ঘুমুই নি! আগে আগে কী হতো জানেন ? গরম হয়ে থাকতো মাথাটা, ভালো করে ঘুমোতে পারতাম না, মাঝরাতে চম্‌কে চম্‌কে উঠতাম।

কিন্তু সংসারই বা এভাবে চলতে পারে ক'দিন ? মুন্নী বনের কাঠ কুড়িয়ে, সেই কাঠ ব্যাপারীদের কাছে বিক্রী ক'রে, খুব কষ্টেই 'খরচা' চালাতো। আমি আশায় ছিলাম, রাজাবাহাদুরের লোক এসে টাকা দিয়ে যাবে। রফিকচাচা নিজে গিয়ে দরবার ক'রে এলো শহরে, তবু পাওয়া গেল না ; তার কাগজপত্রই নাকি তৈরী হয় নি।

এরও পরে কতোবার খবর পাঠিয়েছি, কোনো ফল হয়নি। আমীনরা এসেছেন, তাঁদেরও ধরেছি। তাঁরা বলেছেন,—টাকা আসবে, ভাবনা কী? আজ না হয় কাল।

কিন্তু, কতো 'আজ-কাল' যে কেটে গেল, তার ঠিক নেই। শুক্‌নো বালির মতো হয়েছে যার ঘরের অবস্থা, তার কাছে কয়েক ফোঁটা জলের মতো মুন্নীর ঐ সামান্য রোজগার, কতটুকুই বা কাজে আসতে পারে? তাই এতো চেষ্টা করতাম টাকাটার জন্য। পরে মনে হলো, তবে কি মুন্নীর কথাটাই ঠিক? আমার টাকা মুন্‌সী-আমীন্‌রাই পেটে পুরেছে, আমার কাছে এসে আর পৌঁছবে না? শেষ পর্যন্ত, এমন হলো যে, ও-টাকার আশাই ছেড়ে দিলাম।

মুন্নী বলতো,—ও সব ভাবছো কেন?

চুপ করে থাকতাম। মুন্নী শুধু পেয়ার নয়, সেবা আর স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে রাখতো। সন্ধ্যের পর দাওয়ায় বসে আছি, ও' এসে বসতো পাশে, মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতো মাথায়। বলতো,— চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে ভেবে ভেবে। ভাবছো কেন অতো?

কথা বলতে পারতাম না, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌তো, চোখ আসতো জলে ভরে। মনে হতো, হায় ভগবান, আমাকে অকেজো করে দিলে! এ-ত্বনিয়ায় আর আমি কোনো কাজে লাগবো না?

মুন্নী অবাক হয়ে বলতো,—ওকী! মরদমানুষ না তুমি?

যত্নে চোখের জল মুছিয়ে দিতো আঁচল দিয়ে। আদর করতো।

ক্রমে ক্রমে এমন হলো যে, ওর ঐ অতো স্নেহ আর সেবায় যেন আমি হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম।

ওদিকে, জুবেদা কিন্তু তার আসা থামায় নি, রোজ বিকেলেই সে আসতো। আজকাল মুন্নীরও আর ভয় হয় না তাকে। আমার

পাশটিতে বসে সে জুবেদার খেলা দেখে,—পচা পুরাণো সুতোর বাঁধনে অতো বড়ো জীবটা কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে।

মুন্নী বললে—ও আমাকে আর কিছু বলে না, তা জানো?

বললাম—জানি। তোমাকে আজকাল ও বরং পছন্দই করে।

মুন্নী বললে—বোধহয় ও ভালো হয়ে গেছে, তাই না?

বললাম—কী করে বলি? হাতিশালায় তো যায় না! জঙ্গলে গিয়ে-গিয়ে বুনো হয়ে যায় যদি!

ও বললে—তা' বটে। কিন্তু কী হবে তা'হলে?

বললাম—সেই কথাই তো ভাবি দিনরাত। কারুর বাগানে গিয়ে কোনোদিন ঢুকে না পড়ে।

ও বললে—কী হবে তা'হলে?

বললাম—হবে আবার কী সে 'এত্তেলা' পাঠালেই শহর থেকে শিকারী আসবে বন্দুক হাতে। পাগ্‌লা হাতীকে গুলী করে মারলে এখানে কোনো 'গুনাহ' নেই।

মুন্নী হঠাৎ মুখ টিপে একটু হাসলো। বললো,—আর খারাপ মেয়েমানুষকে গুলী করে মারলে?

—জানিনা। কিন্তু এ-কথা বললে কেন তুমি!

মুন্নী বললে,—এম্‌নি।

বললাম,—খারাপ মেয়েমানুষ কাকে বলে, বোঝো?

মুন্নী বললে—বুঝবো না কেন? যে নিজের মরদ থাকতেও বাংলোতে যায় অন্য মরদের কাছে।

—কে বললে তোমাকে এ-কথা?

—কে আবার! নিজেই বুঝি না বুঝি?

আমার মন তখন দিনে-দিনে অনেক বদলে গিয়েছিল বাবুজী। আমার এই পা-খানা কাটা যাবার পর থেকে আমিও যে ভিতরে ভিতরে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছি,—তার খবর কি আমি

নিজেই জানতাম? গম্ভীর গলায় তাই ওকে বললাম, এ' তোমার লোকালয় নয়,—এ' জঙ্গল। এখানে তোমার ও-নিয়ম খাটে না।

ও' আমার মুখের দিকে চট্ ক'রে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করতে চাইলো, কী, বলতে চাও কী?

ধীরে ধীরে বললাম—তাছাড়া, কথাটা কি জানো? যে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেছে, চিরদিনের জন্য যার শরীর ভেঙে গেছে, সেই মরদকে ফেলে অন্য কারুর কাছে যাওয়ায় কোনো 'গুনাহ্' নেই।

চুপচাপ শুনলো আমার কথা। কী যেন একটুক্ষণ ভাবলো, তারপরে বললো,—এ-তোমার অভিমানের কথা।

আমি উত্তর দিলাম না।

ও' আবার বললো,—এই যে তুমি এতকাল ঘরে ছিলে না, বিশ্বাস করো, আমিও কোথাও যাইনি।

মুখের দিকে তাকালাম। কথাটা এতদিন পরে এই প্রথম উঠে পড়লো হঠাৎ। ও-আমাকে এ-সব কথা বলেনি, আমিও শুনতে চাইনি। না শুনলেও, চোখদুটো তো আছে? ওর বাপ এসে কতো তাগাদা, কতো ধমক, কতো কাকুতি-মিনতি করে গেছে ওকে, তবু সে নড়াতে পারেনি,—এটা দেখেছি, আর মনটা খুসিতে ভ'রে গেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ব্যথাও অনুভব করেছি।

কিন্তু মনের এ-চিন্তা ওকে না শুনিয়ে, ওকে জিজ্ঞাসা করে বস্‌লাম,—কেন, যাওনি কেন?

মুন্নী গলার স্বর নামিয়ে, যেন নিজের মনে মনে কথা বলছে, এম্‌নি ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলো,—তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, আর মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেল। ঘরে বসে-বসে ভালো লাগতো না, বাইরে যেতেও ভালো লাগতো না। একে-ওকে যাকে পেতাম ধরতাম, বলতাম, আমাকে তোমরা শহরে নিয়ে যাবে—, হাসপাতালে?

বললাম—হাসপাতালে তুমিতো যেতেই।

ও' আমার হাতের ওপর ওর হাতখানা রেখেই কী-অদ্ভুত ব্যাকুল গলার স্বরে বলে উঠলো,—সত্যি গো, দিনরাত ভাবতাম তোমার কথা। ভাবতাম, লোকটাকে ছেড়ে আমার একটুও ভালো লাগছে না কেন? ও' থাকতে তো বাংলোয় যেতাম, কিছু মনে হোত না। কিন্তু ও' নেই, তবুও কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না কেন? দিনে দিনে বুঝলাম, এই-ই হচ্ছে সাচ্চা জিনিষ।—

—কী?

—পেয়ার, মহব্বৎ।

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, ওর চোখদুটি ভ'রে গেল জলে, গলার স্বরও ধরা-ধরা। সেই কান্নাভরা গলায় মুন্নী বললে,—তুমি একটা কথা বিশ্বাস করবে? এই 'পেয়ার' মনে জাগলে মন আর কিছুই চায় না, আর চায় না বলেই সারাটা দিন বসে বসে তোমার কথা ভাবতাম। বাপু এসে-এসে কতো ডাকতো, আমি রেগে উঠতাম। চুপচাপ বসে বসে তোমার কথা ভাবতেই ভালো লাগতো।

কথা বলতে বলতে আব্বাসীর নিজের কণ্ঠস্বরই ধ'রে এলো। আমার চোখে ঘুম নেই, তন্দ্রার লেশমাত্রও নেই, মহীশূরের সুবিখ্যাত 'বৃন্দাবন-বাগ'-এ বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর জীবন-কাহিনী শুনে চলেছি। পরিবেশ এতো নীরব—এতো নিথর যে গাছের একটি পাতা টুপ্ ক'রে ঝ'রে পড়লেও বুঝি শুনতে পাবো সঙ্গে সঙ্গে।

ততক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আব্বাসী আবার বলতে শুরু ক'রেছে—বাবুজী, মুন্নী সেই সব দিনে বড়ো তাজ্জবের কথা ব'লতো। বলতো,—মানুষ একা-একা নিজের মনে ব'সে ব'সে ভাবলে, অনেক-কিছু আপনা থেকেই জানতে পারে।

আবার এক-একদিন বলতো,—কখনো-সখনো মানুষের একেবারে একা থাকা দরকার, তাই না?

ব'লতাম,—একা-একা এবার থাকতে চাও বুঝি তুমি ?

রাগ ক'রে বলতো,—যাও দুষ্টুমী ক'রো না।

তারপরে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতো,—একা-একা থাকিনি কী ?

বলতাম,—কেন ? থাকতে কেন একা-একা ?

—ভালো লাগতো ব'লে।

—কেন ভালো লাগতো ?

আমার মুখের দিকে চট্ ক'রে ফেরাতো ওর মুখ। খুব 'দর্দ' বা ব্যথা পেলে মানুষের মুখ যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে ওর মুখখানা। আর দেখতে দেখতে ওর বড়ো-বড়ো চোখদুটি ভ'রে এলো জলে। বললে—তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না আমার মোহব্বতের কথা, তাই না ?

'দিল্‌লাগী'র রেশটুকু মিলিয়ে গেল আমার দিল থেকে। ওর হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার গলার স্বরও কেমন-যেন ধরা-ধরা শোনালো। বললাম,—বিশ্বাস করেছি বই কি।

বেশ কিছুদিন ধ'রেই ওর একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করছিলাম বাবুজী,—কাজ করছে, কি, কাজের মাঝে ফাঁক পেলে একটু ব'সে আছে,—অম্‌নি কেমন যেন 'আনমনা' হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। 'আন্‌মনা' হয়ে কী-যেন চিন্তা ক'রছে নিজের মনে !

আজ, *ঠিক* তেমনি 'আন্‌মনা' হ'য়ে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে নিজের কথা, এম্‌নি ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—সেই যে আমি তোমার চোখের সামনে *দিয়েই* বাংলোয় হেঁটে যেতাম ? তুমি মুখে কিছু বলতে না বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তুমি যে ব্যথা পেতে.—তা' আমি পরে—একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে —বেশ বুঝতে পারতাম !

ব'লতে বাধা নেই, ওর এই কথাটায় আমি মনে মনে একটু চমকেই উঠলাম। আর, তার পর মুহূর্তেই মনে হলো, যেন আমার বুকের ভিতরটা আনন্দের জোয়ার লেগে একেবারে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

বাবুজী, ও-তো আমার ছিলই, এবার ওকে যেন আমি নতুন করে ফিরে পেলাম। আর, এ-পাওয়া যে কী অদ্ভুত পাওয়া, তা' আমি বলে কাউকে কখনো বোঝাতে পারবো না! রফিক-চাচা 'সর্দার' হবার পর হাজারো কাজ বেড়ে গেছে তার। আজকাল সে না-তৈরী করে ঘুড়ি, না-বসায় গানের আসর। তবু, মাঝে মাঝে ফাঁক পেলে গুণ্-গুণ্ করে। দিন কয়েক আগে তার ঘরের সামনে চৌপায়ার ব'সে অনেক দিন পরে চাচা ধরেছিল একটা অদ্ভুত গজল, আমি তখন ক্রাচে ভর দিয়ে চাচার কাছে একটু বসেছিলাম গিয়ে। চাচা যা গাইলো, আমার অন্তরে যেন তা সেদিন কেটে কেটে বসে গিয়েছিল। শুনবেন বাবুজী?—"বাল বিখ্‌রাকে টুটি করবেঁাপে জব কোই

মেহেজবীন রোতি হ্যায়,

মুঝ্‌কো অকসর খেয়াল আতা হ্যায়, মৌত

কিত্‌নি হসীন হোতি হ্যায়।"

যখন কোনো মেহেজবীন—মানে, সুন্দরী মেয়ে—ভাঙা কবরের কাছে বসে মাথার চুল এলিয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে, তখন আমার মন বলে,—মরণের মতো এতো অপরূপ বুঝি আর কিছুই নয়!

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আমি নজর করেছিলাম বাবুজী। মুন্নীকে দেখে আগে আগে জুবেদা কেমন কান খাড়া করতো, শুঁড়টা শক্ত ক'রে নামিয়ে রাখতো,—মনে হতো, ওকে সে একেবারেই দেখতে পারে না। আমার নিজের পর্যন্ত ভয় হতো মাঝে মাঝে। মনে হতো, ওকে মেরে ফেলবেই নাকি জুবেদা?

কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! জুবেদা আজ পাগল হয়ে গেছে, তবু মুন্নীকে দেখে সে আজকাল আর কিছুই করে না। কানও খাড়া করে না,

শুঁড়ও শক্ত করে না। বরং মনে হয়, জুবেদা আজকাল ওকে পছন্দই করে।

ঐ যে মুন্নী সেদিন বলেছিল না? একা-একা নিজের মনে বসে বসে ভাবলে মানুষ অনেক কিছু নিজেনিজেই জানতে পারে? কথাটা খুবই মনে লেগেছিল আমার। মুন্নী যখন অন্যদিকে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতো, আমি তখন চুপচাপ বসে বসে—কখনো মুন্নী, কখনো জুবেদা, —দু'জনের কথাই ভাবতাম। জুবেদা 'নাদান জানোয়ার'—অবোধ জন্তু,—, তবু ওর একটা মন ছিল বাবুজী। সেই মন দিয়ে ও' বোধ হয় সাচ্চা 'মোহব্বৎ'-এর কথাটা বুঝতে পারতো। মুন্নী যে আমাকে আজকাল 'সাচমুচ' পেয়ার করে,—এটা বুঝতে পেরেই জুবেদা বুঝি ওর ওপর সদয় হয়েছে। আর তা'ছাড়া, জুবেদার 'কুরবানি' বা ত্যাগের মহিমাটা ত' আমার কাছে ততদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বাবুজী। আমাকে ও' পায়ের নীচে পিষে ফেলেছিল, কিন্তু সে ত' একটা দুর্ঘটনা! কিন্তু ঐ অবোধ জন্তু তার জন্য বুঝি ভিতরে-ভিতরে নিজেকেই দায়ী ক'রে বসেছিল। তা'নইলে অন্য মাহুতের 'খিদ্‌মদ্‌গারী' ও নেয়নি কেন? অন্য হাতিকে বশ করার 'কোশিস্' বা চেষ্টাটা পর্যন্ত ওর চ'লে গিয়েছিল। যে-দাঁতালটাকে আমরা সেবার ধ'রেছিলাম, ওর তো তাকে ভালোই লেগেছিল, কিন্তু তার দিকে আর কোনোদিনই ও' ঘেঁষলো না! একে 'কুরবানি' ছাড়া আর কী বলবো বলুন? বাবুজী, আমি জোর ক'রে বলবো,—আমারই জন্য ও' বাউরা হয়ে গেছে,—বিলকুল 'বাউরা!' একটা 'মামুলী' জানোয়ার, কিন্তু আমার জন্য তার এই 'কুরবানি'টা কতো বড়ো, বলুন তো বাবুজী?

আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে হ'তে লাগলো—মুন্নীও এক 'মামুলী' জংলী মেয়েমানুষ,—সে যা করেছে, সে-ও তো 'কুরবানি!' তার ত্যাগটাও তো কম নয় বাবুজী!

দিন কেটে যায়, আমার ভাঙা 'তন্দুরস্তী' আর সবল হলো না।

শুধু একটা 'পা' যাওয়াই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটাও শুকিয়ে যেতে লাগলো। একটু হাঁটলেই বুক ধড়ফড় করে। মেহনৎ একটু বেশী হলেই মনে হয়, বুকটার ওপর কে যেন ভারী একখানা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে, এখুনি দম বন্ধ হয়ে যাবে!

মুন্নী বলে,—ভেবো না, আমি দাওয়াই নিয়ে আসবো।

দাওয়াই নিয়ে আসে যতো সব জঙ্গলের লতাপাতা। একটু বল পাই সত্যি, কিন্তু, দিন কয়েক পরে আবার যেই-কে-সেই! ওর উদ্বেগ লক্ষ্য ক'রে বলি,—কী হবে আর ওষুধ-বিষুধ দিয়ে,—এ আর ভালো হবার নয়।

ও' শুনবে না, একদিন নিজে গিয়ে ডেকে আনলো রফিক-চাচাকে। বললো,—আপনি নিজের চোখেই দেখুন ওর তবিয়ৎ!

রফিক-চাচা চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপরে যেন চমক ভেঙেই বললে,—আব্বাসী, তোর তক্‌লিফটা হচ্ছে কোথায়?

অল্প একটু হেসে বললাম,—তক্‌লিফ অন্য কোথাও নয় চাচা, মুন্নী আমার ভাঙা শরীরটাকে জোড়া লাগাতে চায়, এটা যতো দেখি, ততই আমার তক্‌লিফ বেড়ে যায়,—মনের তক্‌লিফ!

মুন্নী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না চাচা, আপনি ওকে আবার শহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন,—শহরের হাসপাতালে।

রফিক-চাচা ঠিক তখনই কিছু বললেন না, কিন্তু দিন-দুয়েকের মধ্যেই একটা লরীর সাহায্যে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সঙ্গে কে যাবে আমার? মুন্নীর যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু চাচা ওকে যেতে দিলেন না, বললেন,—শহরে অতো তড়িঘড়ি 'আওরৎলোগ'-এর যাওয়াটা ঠিক নয়।

মুন্নী বললে,—লেকিন, ও রোগা লোক, একা-একা যাবে কী ক'রে?

রফিক-চাচাদের তখন খুব কাজ পড়েছে, কারুরই বিশ্রাম নেই। একে তো হাতিশালার হাতিদের খিদ্‌মদ্‌গারী, তার ওপরে নতুন হাতির গায়ে 'খর্‌রাবুরুষ' ঘষা, তাদের খানাপিনা, তাদের মেজাজ-মর্জি মাফিক চলা,—কম তক্‌লিফের কথা নয়!

চাচা বললে,—তোর শ্বশুর যাক্ না আব্বাসী? এখন তো কোনো 'রইস্‌ আদমী' নেই বাংলোয়।

তাকে খবর দিয়ে আনানো হলো। সে বললে,—'আদমী' নেই বটে, কিন্তু আসতে কতক্ষণ?

মুন্নী বাপের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করলো, শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললো, বুড়োকে তবু টলানো গেল না। এখানকার কথা-কাটাকাটির আওয়াজ আপ্পানার কানে গিয়েছিল, লাল জবাফুলের মতো চোখ দু'টো দু'হাতে কচলাতে কচলাতে সে এসে হাজির হলো। সব শুনে বললে,—কুছ্‌ পরোয়া নেই, আমি যাবো।

মুন্নীর বাপ বললে,—তুই যাবি কী রে? যদি বাংলোয় কোনো সাহেব এসে পড়ে?

—ঈস্‌, আমার মাথা কাটবে!—আপ্পান্না বললে,—রিপোর্ট করবে? করুক। দেশের ছেলে বুক ফুলিয়ে দেশে চলে যাবে! আপ্পান্না কারুর পরোয়া করে না। চলো ভাই আব্বাসী, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। চলো।

গেলাম হাসপাতালে। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর ডাক এলো। ডাক্তার সাহেবরা আমাকে নানানভাবে দেখলো ভালো ক'রে। তারপরে বললে,—খৎ লিখে দিচ্ছি 'মাইশোর'-এ চলে যাও, বড়ো হাসপাতালে।

'খৎ' নিয়ে বাইরে এলাম। আপ্পানা বললে,—কী বলে ডাগ্‌দার? সমস্ত শরীরের মধ্যে কী একটা ভয় যেন শির্‌-শির্‌ ক'রে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, 'বড়ো হাসপাতাল' কেন? তবে কি আমার কোনো

খারাপ অসুখ হলো? যদি তাই-ই হয়, তবে আমাকে আবার হাসপাতালে শুইয়ে রাখবে বেশ কিছুদিন। কিন্তু এবার আর তা' আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। মুন্নী হয়তো আমাকে দেখতে যাবে, 'মুন্নী'কে তাই মাঝে মাঝে আমি হয়তো দেখতেও পাবো, কিন্তু জুবেদা? বাউরা জুবেদার কী হবে? হয়তো আরও 'বাউরা' হয়ে যাবে আমাকে দেখতে না পেয়ে। লোকজনদের অসহ্য মনে হবে, তারা চিঠি লিখবে শহরে, শিকারী আসবে বন্দুক নিয়ে, 'বাউরা হাতি'কে একেবারে শেষ করে ফেলবে।

ভাবতে ভাবতে মনটা আমার এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো যে চোখের জল আমি সাম্‌লাতে পারলাম না।

আপ্পানা অবাক হয়ে বললে,—কী হলো? কাঁদছিস কেন?

বলে উঠলাম,—আপ্পানা, কাউকে বলবি না, বল.?

—না।

বললাম,—ওরা আমাকে বড়ো শহরে বড়ো হাসপাতালে পাঠাতে চায়।

—কেন?

বললাম,—কেন আবার? সেখানে আচ্ছা-আচ্ছা ডাগদার আছে, সেখানে আচ্ছা-আচ্ছা দাওয়াই মিলবে।

ও বললে,—কিন্তু অসুখটা কী তোর? বুখার ত নেই?

—না।

—তবে?

ওর হাতে 'খৎ'-টা তুলে দিলাম। বললাম,—এতে সব লিখে দিয়েছে 'আংরেজী'তে। কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারিস? আপ্পানা 'খৎ' নিয়ে ডাক্তারদের কাছে ঘোরাঘুরি শুরু ক'রে দিলে। বারান্দা দিয়ে কতো ডাক্তারই না আসছে-যাচ্ছে। বুড়ো-ও আছে, জওয়ান-ও আছে, নানান বয়সের। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায়

একজনকে ধরলো আপ্পানা। তার কাছ থেকে 'অসুখ'-এর কথাটা জেনে নিয়ে এসে বললো,—তোর ছুটো 'বিমার' হয়েছে। পেটের একটা বিমার। আরেকটা বিমার, শরীরে রক্ত কম, শরীরে রক্ত হচ্ছে না।

শুনে, যেন হাফ্ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। 'খারাপ অসুখ' বলতে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল দীন মহম্মদ সাহেবের কথা।

দীন মহম্মদ সাহেবের যে-বিমার হয়েছিল, তাতে কেউ বাঁচে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকদিন ভোগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেরে উঠতে তো কাউকে দেখলাম না!

আপ্পানার কথা শুনে মনে যেন বল ফিরে পেলাম। 'খৎ'টা ওর হাত থেকে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম।

ও বললে,—এ কী করলি?

বললাম,—আপদ গেল। ঘরে ফিরে যাই, মুন্নী আমাকে দেশী দাওয়াই খাওয়াবে, ভাঙা 'তন্দুরস্তী' আবার জোড়া লেগে যাবে।

'মুন্নী'র কথায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী মনে ক'রে ও' হেসে ফেললো। তারপরে খুশী হয়ে বলে উঠলো,—বহুৎ আচ্ছা! এই তো মরদের মতো কথা! যতোদিন বাঁচবো, ততদিন 'জিন্দগী' নিয়ে জুয়া খেলবো, তারপরে যাবার সময়, পট ক'রে চলে যাবো!

ততক্ষণ কথা বলতে-বলতে আমরা হাসপাতাল থেকে বাইরে চলে এসেছি। ওর কথায় আমিও প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলাম। ও'-ও হাসলো। তারপরে বললে,—এখন কি করবি? লরী তো ফিরবে সেই তিনটের সময়, এখন বেলা বারোটাও বাজেনি। কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্, আয়।

'কিছু' যে শুধু খেলামই ছু'জনে মিলে তা নয়, আপ্পানার নেশার টান পড়ায় ও' যেখানে গেল, আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। গোলপাতায় ছাওয়া কতকগুলো ঘর, সেখানে ওর চেনা মানুষজন থাকে দেখলাম।

সেখান থেকে একটা বোতল নিয়ে ও' চলে গেল একটা ভাঙা মস্‌জিদের পিছনে। জায়গাটায় লোকজন নেই ভেবেছিলাম, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে চম্‌কে উঠে দেখলাম, আপ্পানারই পথের পথিক একটি মানুষ অন্ধকার একটি কোণ বেছে নিয়ে মেঝর ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমাদের সাড়া পেয়ে জড়িত গলায় বললে,—কী ভাই, তাড়িয়ে দিতে এসেছো ?

তারপরেই, সুর করে বলে উঠলো,—'ইয়া য়ুও জগাহ্ বতা দে কি যাঁহা পর খোদা না হো !'

কথাগুলো কানে আসতেই ধ্বক্ ক'রে উঠলো বুকের ভিতরটা। অনেক দিনের আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। দীন সাহেব আমাকে সবসময় চোখে-চোখে রাখতেন, যাতে আমি কখনো 'সরাব' না ছুঁই। নিজেও কখনো ছুঁতেন না।

রফিক-চাচার সঙ্গে দীনসাহেবের খুব 'দোস্তি' ছিল, সে-কথা তো আগেই বলেছি। অনেকদিন আগেকার কথা, রফিক-চাচা দলে পড়ে একবার সহর থেকে 'সরাব' পিয়ে এসেছিল। এসে, দীনসাহেবের কাছে ব'সে সে কী গান! যেন গজলের ফোয়ারা ফুটিয়ে তুলেছিল চাচা। সেইদিন চাচার মুখে এই গজলটা শুনেছিলাম। সব কথাগুলো আমার মনে নেই, তবে কথার ভাবটা আমার মনে আছে। মসজিদের পাশে এক সরাবী সরাব নিয়ে বসেছিল দেখে, মৌলানারা তাকে বারণ করে। সেই বারণ শুনে সরাবী বল্‌ছে,—আমাকে বারণ ক'রো না। এটা খোদার জায়গা বলে বারণ করছো ? তাহলে, আমাকে এমন একটা জায়গা দেখিয়ে দাও—যেখানে খোদা নেই ?

যাই হোক, আপ্পানা লোকটির সঙ্গে দেখতে-দেখতেই 'দোস্তি' পাতিয়ে ফেললো। আমাকে ডেকে বললে,—তুই আয়, খাবি না ?

সদিনকার ঘটনাগুলো আমার চোখে এখনো স্বপ্নের মতো লেগে রয়েছে ! রফিক-চাচা দীনসাহেবকে এমনি ক'রেই সরাব

মুখে দেওয়াবার জন্য জেদ ধরেছিলো। তার উত্তরে একটু হেসে দীন সাহেব বলেছিলেন একটি বয়েৎ। 'বয়েৎ'-এর কথাগুলো একেবারেই মনে নেই, তবে তার মানেটা কিছু-কিছু মনে আছে। বলেছিলেন,—খোদার চিন্তার সরাব তো ফোঁটা ফোঁটা সবসময়ই শরীর-মনে গিয়ে প্রবেশ করছে, তুমি আর নতুন ক'রে খাওয়াবে কী ?

না বাবুজী, খোদার চিন্তার সরাব আমি পান করি নি। সে ক্ষমতাই বা আমার কই ? কিন্তু সেই যে পা-কাটা অবস্থায় হাসপাতালে ছিলাম, সেই থেকে চিন্তা করাটা কেমন একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কী-যে কখন ভাবি, তার ঠিক নেই, কিন্তু ভাবনা একটা চলছেই সবসময়—ভিতরে ভিতরে।

কিন্তু, যাক্‌গে সে কথা। বাবুজী, সেদিন আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন আমাদের অবস্থা দেখে মুন্নী একেবারে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে উঠলো। আমার অবস্থা আর কিছুই নয়, আসতে যেতে দুব্‌লা শরীরে খুব তকলিফ্ হয়েছিল। মুন্নী আপ্পানাকে ভরপুর মাতাল লক্ষ্য করে ভাবলো, আমিও সেই পথের পথিক হয়েছি।

আপ্পানাকে ধরাধরি ক'রে সবাই বাংলোয় নিয়ে গেল। ও'-ও তখন সুর ধ'রেছে ওর নিজের ভাষায়। সে ভাষা জানি না, কিন্তু আন্দাজে মনে হলো, সেই শহরের সরাবীটির মতোই, বুঝি ও' বলছে,—এমন জায়গা তা'হলে দেখিয়ে দাও, যেখানে ভগবান নেই !

মুন্নী আমাকে ধ'রে ঘরে নিয়ে এলো। বললে,—নিশ্চয়ই তুমি মদ খেয়েছো ! বলো, খেয়েছো কিনা। আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠালাম, আর তুমি এই-ক'রে এলে !

ওকে এক হাতে ধরে কাছে টেনে নিলাম। বললাম,—মুন্নী আজ আমার মনটা বড়ো খুশ্ আছে। একটা কথা শুনেছি বড়ো ভালো। আগেও শুনেছিলাম, এবার নতুন করে শুনলাম। কথাতো জীবনে কতো শুনি, কিন্তু সবকথা সব সময় মনে লাগে না। কিন্তু

মনে যখন লাগে, তখন সারা মনটা আনন্দে ভরে যায় কিনা, বলো? সত্যি মুন্নী, এমন জায়গা দেখিয়ে দাও তো, যেখানে ভগবান নেই।

ও বললে,—তুমি বসো দেখি চুপ করে।

ব'সে, ওকে আরও কাছে টেনে নিলাম! বললাম,—আমার মুন্নী, মুন্না—আমার ঘরেও ভগবান আছেন! নইলে, যা আমার পাবার নয়, তাই পাই কেন?

—কী পাও?

বললাম,—তোমার মোহব্বৎ।

ও' হেসে উঠলো। বললো,—এই ব্যাপার! আমার মতো মেয়ের 'মোহব্বৎ' কি পাওয়ার মতো জিনিষ? এই তো শহরে ছিলে হাসপাতালে শুয়ে, কতো-সব খাপসুরৎ আওরৎ ঘুরছিল—তাদের কারুর মোহব্বৎ যদি পেতে, তা'হলে বুঝতাম,—যাহোক, তবু একটা-কিছু পেয়েছো!

বলে উঠলাম, ছি-ছি, ও-কথা বলতে নেই। সাচ্চা মোহব্বৎ যখন মানুষের মনে জাগে, তখন সে খোদার কাছাকাছি থাকে, ভগবানের পা ছুঁয়ে থাকে।

ও' বুঝি একটু চম্‌কেই উঠলো। বললো,—এ-কথাটা তুমি কোত্থেকে পেলে?

বললাম,—শুনতাম দীন সাহেবের কাছেই। কিন্তু তখন কথাটা ঠিক বুঝতাম না। আজ বুঝি।

চুপচাপ বসে-বসে কথাটা ও' বোধ হয় ভাবতে লাগলো। তারপর একসময় যেন চম্‌ক ভেঙেই ব'লে উঠলো,—জুবেদাও তোমাকে 'পেয়ার' করে, ও-ও কি 'খোদার সামিল' হয়েছে?

সত্যি বলছি বাবুজী, জুবেদার কথা এতক্ষণ ভাবি নি, ওর কথায় মনে হলো—ঠিক কথাই তো! জুবেদাই বা পেয়ারের দিক থেকে কম কিসে? ভগবানের পা ছুয়ে আছে জুবেদাও। নইলে

'বাউরা' জুবেদা, জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, ওর তো বিপদ হতে পারতো যে-কোন মুহূর্তে! কিন্তু, তা, তো হয়নি? কথাটা মনে হ'তেই মনটা যেন আরও খুশীতে ভ'রে উঠলো। ছ'হাতে মুন্নীকে সজোরে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম,—আমার মুন্নী, জুবেদা আজকাল তোমাকেও 'পেয়ার' করে, তা' জানো?

মুন্নী কিন্তু সে-সব কথার ধার দিয়েও গেল না। মুখে শুধু বললে—হ্যাঁ, তা' করে। আমি ওর গায়ে হাত দিলেও রাগ করে না আজকাল। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমার 'ইলাজ'-এর কী হলো?

ওর হাতখানা নিয়ে গালে-কপালে-ঠোঁটে বারবার ছোঁয়াতে লাগলাম, বললাম,—আমার 'ইলাজ' তোমার হাতে।

ও' রাগ ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিলো, বললো,—যাও—খালি তোমার তামাশা!

পরদিন, আপ্পান্না যখন সহজ মানুষ হয়েছে, তখন ওকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো মুন্নী। প্রথম কথাই শুরু করলো ঝংকার দিয়ে,—হর্ বখৎ সরাব পিয়ে ব'সে থাকিস, তোর শরম নেই!

আপ্পানা তার ঘোলাটে চোখছুটি তুলে তাকালো। বললো,—হর্ বখৎ আমার মতো 'গন্ধিকাম' করতে হলে, তোদেরও হর্ বখৎ সরাব পিয়ে থাকতে হতো!

—যা—ভাগ্!—আমরা 'গন্ধিকাম' করতে যাব, কেন? আমরা কি মেথর?

আপ্পানা বললে,—আমিও মেথর কিনা কে জানে!

বলে উঠলাম,—একী বলছিস তুই, আপ্পানা?

আপ্পানার মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, বললে,—শুনেছি, গরীব বাপ-মা খেতে না পেয়ে বাচ্চাদের অনেক সময় মেথরদের কাছে পর্যন্ত বিকিয়ে দেয় টাকা নিয়ে। আমি সেইরকম কি-না:কে জানে! ছোট থেকে সদ্দার-সদ্দারনী দেখে এসেছি, বাপ-মা

তো কাউকে দেখিনি। ছোট থেকে কাউকে 'বাপু' কি 'আম্মা' বলে কখনো ডাকতে পারিনি।

বলতে-বলতে আপ্পানার গলাটা ধরে এলো, বললে—'গন্ধিকাম' করবো না বলে জঙ্গলে চলে এলাম। কিন্তু, 'দুস্‌রা কাম' জানিনা! তাই পেটের জন্য এখানেও ঐ কাম করতে হচ্ছে। জঙ্গলে এসে যে জঙ্গলের ফলফুল খেয়ে পেট পুষবো, তারও উপায় নেই, জঙ্গলও ইজারা নিয়ে বসেছে। জঙ্গলের কাঠ কাটলে, কি ফল পাড়লেও মানুষ ধরে লাঠি দিয়ে পেটায়, আর নয়ত, পুলিশে দেয়। মুন্নী-বহিন, সরাব খাই কি সাধে! সরাব খেতে হয়, নইলে হরবখৎ 'গন্ধিকাম' করা যায় না!

এ-কথা ও' বরাবরই বলে। কিন্তু ও'রও জীবনের যে একটা পুরানো কথা থাকতে পারে, তা' আমরা ভাবিনি। ওর কথা শুনতে-শুনতে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ নিঃঝুম ভাবে কাটবার পর যেন হঠাৎ চমক ভেঙেই জেগে উঠলো মুন্নী। জিজ্ঞাসা করলো,—ডাগদারবাবুরা এর 'বিমার'-ব্যাপারে কী বললো, বল্‌।

পাছে বেফাঁস কিছু ও' বলে বসে, তাই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম,—ডাগদারবাবুরা আর কী বলবে? বললে,—ঘরে চলে যাও।

ঝংকার দিয়ে উঠলো মুন্নী, বললে—তুমি চুপ করো তো। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি?

আপ্পানা বললে, হ্যাঁ, কথাটা ঐরকমই বটে। ও'র পেটের 'বিমার' হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিমার। শরীর দুব্‌লা আছে, শরীরে 'রক্ত' হচ্ছে না।

মুন্নী বললে,—দাওয়াই দিলো না? দাওয়াই কই?

বলে উঠলাম,—দাওয়াই আবার কি? বলেছে, জঙ্গলের হাওয়ায় আপনিই ঠিক হ'য়ে যাবে।

—হচ্ছে কই?

—ব্যস্ত হচ্ছো কেন, ঠিক হ'য়ে যাবে।

মুন্নীর মুখখানা কাঁদো-কাঁদো দেখালো। তারই ওপরে ঝাঁঝ দেখিয়ে আপ্পানাকে তাড়া দিয়ে বললে,—যা—পালা। কোনো কম্মের যদি হয় লোকটা!

আপ্পান্না চলে যেতেই পড়লো আমাকে নিয়ে। বললো,—সত্যি বলো, ডাগদার 'দাওয়াই' দিলো না?

বললাম,—এর আবার দাওয়াই কী? কাজ নেই, কম্ম নেই—শুয়ে শুয়ে থাকবো, ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

মুন্নী বললে,—ছাই আমার ডাগ্‌দার! শহরে এত কাণ্ড ক'রে তাহলে পাঠালাম কেন? দেখি, আজ আমি গাঁয়ের দিকে যাবো।

—কেন?

ও বললে,—গাঁয়ে এক বুড়ী আছে, ঝাড়ফুঁক জানে, দেশী দাওয়াই-এর খবর রাখে। দেখি, 'ইলাজ' হয় কিনা?

বাবুজী, এরপরে কতো ঝাড়ফুঁক, কতো জুড়িবুটী, কতো জংলী দাওয়াই! মুন্নী আমাকে সারিয়ে তোলবার জন্য সবরকম 'কোশিশ'ই করেছে। কিন্তু, যা গেছে, তা কি আর ফিরে পাওয়া যায়? পা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরও গেছে। এটা সারালে, ওটা বাড়ে; শরীর যার ঝাঁঝ্‌রা, তাকে কি কেউ ভালো করতে পারে? তাকে ভগবানের দয়ার ওপরেই ছেড়ে দিতে হয়। আপনাকে বলবো কী বাবুজী, এখানে, এই বৃন্দাবন-বাগে আসবার পর, আমার ভাই আপ্পাও আমাকে ভালো করে তোলবার জন্য যথেষ্ট 'কোশিশ' করেছে; আমি বারণ করেছি, ও' শোনে নি। কিন্তু, কী হলো বাবুজী, সেরে কি উঠেছি? না। ঠেকা দিয়ে দিয়ে চলবে। যে-ঘর পড়ো-পড়ো—তাকে ঠেকা দিয়ে যতদিন রাখা যায়,—ততদিনই লাভ। সেই লাভটুকু সম্বল করেই 'অন্তেকাল'-এর দিকে একান্তভাবে তাকিয়ে আছি।

কিন্তু, সে-যাক, যে কথা বলছিলাম, সে-কথাই শুনুন। মুন্নী তো

আমার 'ইলাজ' করবার চেষ্টা কর়ে, আর বনের কাঠ-কুটো কুড়িয়ে খরচা চালায়। তাতে কি চলে? রফিক-চাচার কাছে ধার হয়েছে, গুণ্ডার কাছে ধার হয়েছে, আরও অনেকের কাছে ধার। আমি গিয়ে রফিক-চাচাকে বলি,—রাজাবাহাদুরের লোক তো এলো না টাকা নিয়ে?

রফিক-চাচা একটুক্ষণ ভেবে, তারপরে বললে,—আর একটা 'দরখাস্ত্' লেখা করা।

সে-ও খরচা। আনাচারেক পয়সা নেবে। তা-ও শহরে যেতে হবে।

গুণ্ডাকে ধরলাম একদিন। বললাম,—আমাকে চার আনা পয়সা দে। তোর কাছে টাকা বাকী পড়েছে, তার ওপর এ-ও পড়ুক। একটা 'দরখাস্ত্' লেখা করাতে হবে।

ও বললে,—তোর টাকার?

—হ্যাঁ।

গুণ্ডা বললে—শহরে যেতে হবে যে?

—যাবো।

ও বললে,—থাক, তোকে আর যেতে হবে না, আমিই যাবো।

বললাম,—তুই গেলে দু'দিন তোকে যেতে হবে। একদিন দরখাস্ত্ লেখাবি বাবুদের ধ'রে, সেটা নিয়ে আসবি আমার কাছে, আমি তাতে 'টিপ্ছাপ' দেবো, তারপরে সেটা তোকে আবার নিয়ে যেতে হবে শহরে কাছারীর 'আমিন'-এর হাতে দিতে। লেকিন, আমি গেলে একদিনেই তুই কাজ হয়ে যেতো।

ও বললে,—তাহোক। তোর গিয়ে কাজ নেই—যে হাল হয়েছে, আর ফিরতে হবে না! কেমন তোর 'ঔরৎ,' তোকে দেখ্ভাল করে না?

—চুপ! চুপ! বলে উঠলাম,—ও যা করে, সে তুই ধারণাও করতে পারবি না। বাংলোয় পর্যন্ত যায় না।

ও বললে,—বাংলোয় লোক আছে, যে যাবে? তবে আসছে লোক।

একটু হেসে বললাম,—যাক ও' বাংলোয়, আমার মনে কোনো দুঃখই হবে না।

ভেবেছিলাম, 'গুণ্ডা' মুন্নী-সম্পর্কেই হয়তো কোনো 'খারাপ' কথা বলে বসবে এবার। তা' ও' বললো না। চুপ করে বসে কী যেন নিজের মনে ভাবতে লাগলো।

—কী ভাবছিস্?

ও' যেন 'ভাবনা'র ঘোর লহমায় কাটিয়ে উঠলো। বললো—একটা কথা মনে হয় জানিস? শহর থেকে বাংলোয় যারা আসে, তারা সব 'রইস' আদমী তো বটে? তাদের এ-রোগ কেন?

বললাম,—জঙ্গলের হাওয়ার দোষ। শহরে হরেক রকম 'মজা' আছে,—'বাইশকোপ' আছে, 'খানাপিনা' আছে,—এখানে কী আছে বল্?

রাগ ক'রে 'গুণ্ডা' বললে,—তা' ব'লে, এখানে এসে 'ঔরৎ' নিয়ে 'মজা' করতে হবে! গাঁয়ের লোকেরা শহরের সাহেবদের যে 'জংলী' বলে, ঠিকই বলে।

অল্প একটু হেসে বললাম,—লেকিন, আসল কথা ভুলো না ভাই, 'দরখাস্ত'।

গুণ্ডা তা' করেছিল। যা-যা করবার,—সব। কিন্তু দিন যায়। আমিনও এলো না, মুন্সীজীও এলো না, পেয়াদাও এলো না। ডাকপিওন ডাক বাংলোয় আসে সাইকেল ক'রে। সে-ও কোন 'খৎ' নিয়ে এলো না।

শেষপর্যন্ত এই-ই বুঝলাম, টাকা আমি পাবো না। টাকার জন্য আগে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেবারেও যা হয়েছিল, এবারেও হলো তাই

রফিক-চাচাকে কথাটা বললে দুঃখ দেওয়াই হবে। বুড়োমানুষ 'হাঁকডাক্' করবে, হয়তো শহরেও ছুটবে, কিন্তু করতে পারবে না কিছু।

আমি রফিক-চাচাকে বললাম গিয়ে অন্য কথা। বললাম,—তুমি তো ঘুড়ি তৈরি করা ছেড়ে দিয়েছো। আমাকে শেখাও না? আমি বসে-বসে খুব পারবো।

চাচা বললে,—তোর টাকার কী হলো?

বললাম,—এখনো পাইনি। তবে পাবোই একদিন। রাজা-বাহাদুরের হাতিশালার খিদ্‌মদ্‌গার ছিলাম, আমার পাওনা টাকা ওঁরা কেন দেবেন না?

—তা' ঠিক। তবে, দেরী হয়।

কথা আর বাড়লাম না। মনে-মনে ধারণা হয়ে গিয়েছিল,—দেরী হবে চিরকালের জন্য। 'দেরী' 'দেরীই' থেকে যাবে, 'উলটো'টা আর হবে না। মনে মনেই বললাম,—এই-ই হয়। মানুষ কাজে লেগে থাকলেই লোকের 'নেকনজর' পায়, কাজের বার হয়ে গেলে, আর কে নজর করবে তাকে?

আমি চাচার কাছে বসে ঘুড়ি-তৈরি করাই শিখতে লাগলাম। ঘুড়ী তৈরি করে লরীওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে শহরে পাঠালে, বিক্রী হয়ে তবু তো দু-একটি পয়সা আসবে তাতে?

কিন্তু, তা-ও পারলাম না। বসে থাকতে-থাকতে বুকের মধ্যে হঠাৎ একটি ব্যথা উঠলো। এমন ব্যথা যে, নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। লোকজন ডেকে ধরাধরি করে আমার ঘরে আমাকে দিয়ে গেল চাচা।

মুন্নী দেখতে পেয়ে ছুটে এলো,—কী হলো ওর?

চাচা বললে,—কিছু না, একটু হাঁফ ধ'রেছে বুকে। তেল মালিশ ক'রে দে, সেরে যাবে।

তা' অবশ্য গেল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই, কিন্তু এটুকু বুঝলাম, একটু বেশীক্ষণ বসে-বসে কাজ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শুয়ে রইলাম খাটিয়ার ওপরে। ঘুড়ি তৈরি করে যে পয়সা আনবো, তাও হলো না। রাজাবাহাদুরের লোক যে টাকা দিয়ে যাবে, তা-ও হলো না। তবে, এরই মধ্যে এটুকু ভেবে আরাম পাই যে,—তবু ভালো—শহরের হাসপাতালে আমার পায়ের চিকিৎসাটা হ'য়েছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেছি কোনরকমে। একটা মানুষের পা যদি একেবারে গোড়া থেকেই কাটা পড়ে যায়, তবে সে মানুষটার আর থাকে কী বাবুজী? পুরুষ মানুষ হিসাবে আমি চিরকালের জন্য অকেজো হয়ে গেছি।

দিনের পর দিন এ-ভাবে কেটে যেতে লাগলো, আর আমার মনে কী হতে লাগলো, জানেন? মনে হতে লাগলো, 'কুরবানি' বা ত্যাগের দিক থেকে,—কী জুবেদা—কী মুন্নী,—যেন দু'জনেই আমাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে চলে গেছে! আমার 'জওয়ান' তবিয়তের কালে মুন্নী আমার সামনে দিয়েই বাংলোয় যেতো,—মনে কষ্ট হতো, অথচ, সেটাও আমি সামলে নিয়েছিলাম। এই 'সামলে-নেওয়া'টা একদিক থেকে আমার 'ত্যাগ' ছিল, 'কুরবানি' ছিল। কিন্তু আজ গেছে সেই অভিমান। ওরা দু'জনে যেন, যতো দিন যাচ্ছে, ততই বড়ো হচ্ছে 'কুরবানি' আর ত্যাগের দিক থেকে।

যতো কাছে আসে জুবেদা, আর যতো সেবায়-যত্নে আমাকে ভরিয়ে রাখে মুন্নী, ততই এ-চিন্তাটা আমার মনের মধ্যে কেটে-কেটে বসে যেতে লাগলো বাবুজী। মনে-মনে ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে গিয়ে ভয়ানক 'ছোট' মনে হলো আমাকে, ভয়ানক 'নীচ' মনে হলো। ডাকলাম,—মুন্নী?

কী কাজ করতে যেন ঘরে এসেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে,—কী?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা আর বলতে পারলাম না, শুধু বললাম,—না। কিছু না।

কিন্তু, না বলেও ত থাকতে পারছি না বাবুজী। বন্দুকের গুলী খেলে জানোয়ার যেমন ছটফট করে, আমার মনটা তেমনি ছটফট করতে থাকে সব সময়। শেষ পর্যন্ত, আর থাকতে পারলাম না। মুন্নীকে কাছে ডেকে নিয়ে, পাশে বসিয়ে, তারপরে বললাম,—নিজেকে এমন ক'রে নষ্ট করছো কেন? এর থেকে আমি একটা কথা বলবো?

বুক শুকিয়ে উঠলে মানুষের গলার স্বর যেমন শোনায়, তেমনি শোনালো মুন্নীর গলা, বললে,—কী?

বললাম,—তুমি বরং চলে যাও আমাকে ছেড়ে। কোনো 'মজ্‌বুরি' ও নেই, বাধ্যবাধকতাও নেই।

অদ্ভুত একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো ওর মুখে, বললো,—'বাধ্যবাধকতা' আছে কি নেই, 'মজ্‌বুরি' আছে কি নেই,—তুমি অতো সহজেই তা' বুঝ্‌লো কী ক'রে?

বাবুজী, মানুষ যেমন সব বুঝেও অনেক সময় না-বোঝার ভাণ করে, তেমনি ওর কথার ভাব বুঝেও না-বোঝার ভাণ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বললাম,—দীন মহম্মদ সাহেব তোমার বাবাকে আমার দরুণ যে টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকার কথা বল্‌ছো ত? এতো দিনে কি আর সে-সব শোধ হয়ে যায়নি? নিশ্চয়ই শোধ হয়ে গেছে।

ওর মুখের সব রক্ত যেন সহমায় কে শুষে নিয়েছে মনে হলো। সেইভাবে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আমি যে একথা বলে ফেলতে পারি, এ-যেন ও' কোনো দিনই ভাবতে পারে নি।

তারপরে এক সময় মুখ নীচু করলো, একটু যেন সামলে নিলো নিজেকে। তারপরে মুখখানা উঁচু ক'রে আমার দিকে ফেরালো, অল্প একটু হেসে বললো,—শোধ হয়ে গেছে—না? তা'হলে, আমি স্বাধীন? যা-খুশী তাই করতে পারি?

—নিশ্চয়ই পারো।

নীচের ঠোঁট-টা দাঁত দিয়ে চেপে রইলো এক মুহুর্ত। তারপরে, উঠে দাঁড়ালো। বললে,—বেশ। কথাটা মনে রইলো।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ও' কোথাও গেল না, যেমন ছিল তেমনি রইলো। যেমন কাছে আসে, কথা বলে,—তেমনিই সব করে যায়, কিন্তু যাবার কথা আর ওঠায় না। আমার ত' 'খুশ নসীব' বাবুজী, আমি খেতে পাচ্ছি, আমি সেবা পাচ্ছি,—কিন্তু আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি বলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে 'হায়-হায়' না ক'রে পারি না। ও' কেন নিজেকে নষ্ট করবে এই 'খোঁড়া'— 'তুনিয়ার বার' লোকটার কাছে দিনরাত থেকে, তার ঘর সামলে, তাকে সেবা ক'রে ?

এতদিনে এটুকু বুঝেছি, ওকে যেতে বললেও ও' যাবে না। কী করা যায় ভাবছি, এমন দিনে গুণ্ডা এলো দেখা করতে। বললাম, —হ্যাঁরে, কে যে সাহেব আসবে বাংলোয় বলে গেলি, এলো না তো !

—তাই তো দেখলাম। এলো না।

এ কথা-সেকথার পর ও' চলে গেল। কিন্তু দিনকয়েক পরেই একদিন ছুট্তে ছুট্তে এসে পড়লো আমার কাছে। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে !

অবাক হয়ে বললাম,—কী হয়েছে রে ?

গুণ্ডা বললে,—তোমার জুবেদাকে সাম্লাও। সে একজনের ক্ষেতে ঢুকে তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে ! সব ফসল শেষ করেছে তার ! সে 'হায় হায়' করে মাথা চাপ্ড়াচ্ছে। এমন কি তার অবস্থা দেখে রফিক চাচা পর্যন্ত রেগে গেছে। খবর চলে গেছে শহরে। বন্দুক নিয়ে শিকারী এসে গেল ব'লে। জানো তো, হাতি বাউরা হলে তাকে মেরে ফেলবার হুকুম আছে ?

ও' বলে যাচ্ছে, আর আমার ভিতরে যেন হাজার বিজ্লী চম্কে-চম্কে উঠ্ছে ! থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে সারা শরীর ! গুণ্ডা চলে

গেল খবর দিয়ে, আর আমি সারাটা দুপুর ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাটাতে লাগলাম! ক্রাচে ভর দিয়ে জঙ্গলের ধার পর্যন্ত এগিয়েও গেলাম। কয়েকবার ডাকলাম,—জু-বে-দা!

সাড়া নেই। মুন্নী এসে আমার হাত ধরে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বললে,—এই দুব্‌লা শরীর! বেঘোরে প্রাণ দেবে নাকি শেষটা?

বিকেলে যেমন আসে, তেমনি অবশ্য আজও এলো জুবেদা। আজও এসে ঘরের চালের বাতার কাছ থেকে লাটাইটা বার করলো। আমি লাটাইটা হাতে নিয়ে ওর গলার কাছটা জড়িয়ে ধরলাম। অব্যক্ত কান্নায় গলাটা আমার ধরে আছে। কথা ব'লতে গিয়ে গলার স্বর কেঁপে উঠলো। বললাম,—করেছিস কী জুবেদা? পরের ক্ষেতে ঢুকেছিস? তোকে যে মেরে ফেলবে! বনে খাবার জোটাতে না পারলি যদি, তবে হাতিশালায় ফিরে যা। দানাপানি ওখানে তোর ঠিকই মিল্‌বে।

জুবেদা ডেকে উঠলো শুঁড় উঁচু ক'রে।

অর্থাৎ ও-সব পরামর্শ সে কানেও তুলতে চায় না। সে গিয়ে যেমন দাঁড়ায়, তেমনি দাঁড়ালো বেড়ার খুঁটির ধারে। তার মানে,—কই সুতো দিয়ে বেঁধে রাখো আমাকে?

রাখলাম। কাছে গিয়ে আদর করলাম। বললাম,—হাতি-শালায় ফিরে যা। আমি শিকারী-সাহেবের হাতেপায়ে ধরবো গিয়ে। কিন্তু, তুই লক্ষ্মী না হলে, কাঁহাতক সে আমার কথা শুনবে? —যাবি তো হাতিশালায়?

গেল না। অন্য পথ ধরলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাখী কলরব করছে গাছের মাথায় এসে। চেঁচিয়ে ডাকলাম,—জুবেদা, যাচ্ছিস কোথায়? হাতিশালায় যা।

শুনলো না আমার কথা! বেশ দেখতে পেলাম, গেল জঙ্গলের দিকে। বুকটা আমার ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু, কী-ই বা আমার

করবার আছে ? দুব্‌লা শরীরে চোখে আঁধার লেগে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়তে পারি, শুয়ে-শুয়ে মুন্নীর সেবা নিতে পারি, নিজের মনে গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদ্‌তে পারি ! কিন্তু তারপর ?

দেখতে-দেখতে বাংলোতে লোক এসে গেল। শিকারী। দু-দুটো বড়ো বড়ো বন্দুক তার সঙ্গে !

আর দেরী নয়, কথাটা শোনা মাত্রই ক্রাচে ভর দিয়ে চললাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বুঝিয়ে সব বোলবো। বোলবো,—ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে হাতিটা ; ভালবাসার জন্যই ও আজ পাগল হয়ে গেছে। যাকে ভালবাসত, তাকেই ও আঘাত ক'রে ফেলেছিল, না জেনে ! তাই যখনই জানলো, ওর ভালোবাসার মানুষটিকে নিজেই ও' আঘাত ক'রেছে, ঠিক তখনই ও পাগল হয়ে গেল ! ও জানোয়ার, কিন্তু 'দিল্' তো জানোয়ারেরও থাকে !

বাংলোয়, সাহেবের ঘরের সামনে, সাহেবের উর্দি-পরা বেয়ারা আমায় আট্‌কালো। তাই বাইরে থেকেই ডেকে বললাম,—সাব্ ?

—কৌন্ ?

বললাম,—আমি সেই 'বাউরা' হাতিটার খিদ্‌মদ্‌গার, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ঘরের সামনে পর্দা ফেলা ছিল, পর্দা ঠেলে সাহেব নিজেই তাড়াতাড়ি চলে এলো বাইরে। পরণে হাতকাটা একটা গেঞ্জি আর পা'জামা। দিব্যি দশাসই লম্বা-চওড়া জওয়ান চেহারা। গায়ের রঙ্ ও ঝক্‌ঝকে ফর্সা—যেন ফুটে বেরুচ্ছে গেঞ্জির ভেতর থেকে।

মানুষটির চেহারাই শুধু নয়, মুখ-চোখ আর পাতলা ঠোঁটের হাসি,—সবই আমাকে মুহূর্তে অবাক করে দিলো। এ-যে আমার ভয়ানক চেনা !

অস্ফুট গলায় কোনোক্রমে বললাম,—সাহজলাল সাহেব !

এবার গলা ছেড়েই হেসে উঠলেন সাহজলাল-সাহেব। বললেন, —তোমরা কি ভেবেছিলে,—আমি বদ্‌লী হয়ে গেছি!

—না-না, তা'নয়।—বললাম,—শিকারী তো আরও আছেন রাজা-বাহাদুরের, কিন্তু এই ব্যাপারে বেছে-বেছে আপনিই যে আসবেন, তা' ভাবি নি। এর মধ্যে এতো 'খেদা' গেল, আপনি একবারও এসেছেন বলে তো শুনিনি।

সাহজলাল হাসির জের টেনেই বললেন,—'হেড্‌ শিকারী' হয়েছি যে। তাই যখন-তখন আর আসবো না। কিন্তু, তুমি ভিতরে এসো আব্বাসী, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ?

শরম পেয়ে বললাম,—না-না, ঠিক আছে,—বাইরেই ত বেশ।

এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন সাহজলাল, তারপরে একরকম টেনেই নিয়ে গেলেন ভিতরে। একটা কুর্শিতে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলেন সামনে। বললেন,—তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে, আব্বাসী?

অল্প একটু হেসেই বললাম,—সবই তো জানেন। নিজের চোখেই তো দেখেছিলেন ঘটনাটা?

সাহজলাল বললেন,—তা' বটে। প্রাণে যে বেঁচে উঠেছো, এই ঢের।

বলে উঠলাম,—এ-বাঁচার মানে হয় না সাহেব, এর থেকে মরে গেলেই ভালো হ'তো।

উনি তাড়াতাড়ি বললেন,—অমন কথা বোলো না। পা-কাটা গেছে, তা'তে কী হয়েছে? হেঁটে-চলে বেড়াতে তো পাচ্ছ?

বললাম,—আমি সেজন্য কথাটা বলি নি সাহেব। আপনি তো সেদিন সবই দেখেছিলেন? সবই তো আপনার চোখের সামনে ঘটেছে সেই থেকে যে জওয়ান একটা হাতি অমন 'বাউরা' হয়ে যাবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল?

সাহেবের মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কাছের টেবিল থেকে একটা কৌটা-মতন কী-যেন হাতে তুলে নিলেন, তারপরে সেই কৌটো থেকে সিগারেট্ বার করে ধরালেন। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন,—এখন বেলা প্রায় এগারোটা, তুমি কখন খবর পেলে, যে, আমি এসেছি ?

—এই মাত্র।

—কে দিলে ?

—আপ্পানা।

একটু অবাক হয়েই বললেন—আপ্পানা কে ?

—বাংলোর ঝাড়ুদার।

—ও' বুঝেছি!—ব'লে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন সাহ্ জলাল সাহেব। আমি এবার অসল্ কথাটা পাড়বো বলে মনে করছি, আর ভাবছি, ঠিক কী ভাবে বললে, সাহেব রাগ করবেন না, আর আমারও কাজ হাঁসিল হবে। কিন্তু সাহেব এমন এক বিষয় ওঠালেন যে, আমার সমস্ত কথাই চাপা প'ড়ে গেল।

সাহেব গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ন'ড়েচ'ড়ে বসলেন। তারপরে বললেন,—তোমার ঘর কোন্‌টা হে ? সেই যে একটা প্রকাণ্ড জামগাছ আছে, তার ছায়ায় যে ঘরখানা আছে, সেখানা কী ?

—হ্যাঁ সাহেব, ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু—

সাহেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—'কিন্তু'র কিছু নয়, এম্‌নি জিজ্ঞাসা করছিলাম। তোমার বাসায় বেড়াতেও তো যেতে পারি।

—নিশ্চয়ই যাবেন সাহেব,—বললাম,—আমার গরীবখানায় সাহেবের পায়ের ধুলো পড়লে এ-গরীব ধন্য হয়ে যাবে।

সাহেব হাসলেন, হাতের সিগারেটের ছাই ছাই-দানের মধ্যে ফেলে দিতে দিতে বললেন,—আমি এসেছি কখন জানো ? ভোরবেলায়। এসেই খবর পাঠিয়েছিলাম। কোথায় ছিলে ?

একটু অবাক হয়েই বললাম—ঘরেই তো ছিলাম সাহেব! আমার তবিয়ৎ ভালো নয়, কোথাও যাই না।

—ঠিক মনে করে দেখ, কোথাও যাও নি?

—কোথাও না।

সাহেব বললে,—বাংলোর খানসামাটাকে পাঠিয়েছিলাম।

বললাম,—ও'.আমার শ্বশুর।

—সেও জানি। দেখনি ওকে?

বললাম,—হ্যাঁ, তা' দেখেছিলাম। লেকিন, সে তো আমাকে কিছু বলেনি। রান্নাঘরে গিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে কী সব ফিস ফিস ক'রে কথা বলছিল যেন!

সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। পোড়া সিগারেট-টা ফেলে দিলেন। তারপরে বললেন,—কথাটা তোমাকে তাহলে খুলেই বলি। তোমার জেনানাকে এবার দেখতে পাচ্ছি না কেন? তার বাপকে সকালেই পাঠিয়েছিলাম ওকে ডেকে আনতে? কিন্তু এলো না তো?

কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগলো আমার কথাটা বুঝে নিতে। মনে পড়লো, সাহজলাল সাহেব তো আগে এসেছে, বাংলোয় থেকেছে, মুন্নীর কাছে অজানা মানুষ তো সে নয়! সাহেব যে ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে, তাতে কোনো অন্যায় নেই। বরং ডাক পেয়ে না-আসাটা মুন্নীর পক্ষেই 'গুণাহ্‌গার' হয়েছে।

আমি এই কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না, মুখে যেন আটকে গেল। তার বদলে, 'জলে ডোবার সময় মানুষ মরিয়া হয়ে যেমন যা-পায় তাই আঁকড়ে ধরে', আমি যেন তেমনি করেই অন্য একটা বিষয় আঁকড়ে ধরলাম। বিষয়টা সাহেবের জিজ্ঞাসার উত্তর নয়। তবু বললাম, সাহাব, একটা আর্জি পেশ করবো?

—কী, বলো?

বললাম,—আপনি 'এত্তেলা' পেয়ে 'বাউরা' হাতিকে গুলী করে

মারতে এসেছেন। ও' যদি জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতো, ওকে মারা শক্ত হতো। কিন্তু, ও' রোজ বিকেলে আমার কাছে আসে। আমি আর ওর 'খিদ্‌মিদ্‌গার' নই,—ফাল্‌তু আদ্‌মী, তবু আমার কাছে আসে—'দিল্‌'-এর টানে।

সাহেবের কথার উত্তরে আমি যে 'জুবেদা'র কথা হঠাৎ টেনে আনবো, এটা বোধহয় তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাই অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন,—কিন্তু কী বলতে চাও তুমি ?

ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললাম,—সাহেব, জুবেদা আমার পেয়ারের 'কুম্‌কী,' ওকে আপনি প্রাণে মারবেন না। আমি বলছি, ও' আর কারুর ক্ষেতে কখনো মুখ দেবে না! ও' 'বাউরা' হলেও, আমার কথা শোনে।

সাহেব বললেন,—না-ই যদি মারবো, তা'হলে এসেছি কেন ? শুধু হাতে ফিরে গেলে আমার 'দফ্‌তর'ই বা আমাকে কী বলবে ?

মিনতি করে ব'ললাম,—সাহেব, আপনি এখন ফিরেই বা যাবেন কেন ? আপনি থেকে যান। একটা 'বাউরা' হাতিকে জঙ্গল থেকে খুঁজে বার ক'রে সুবিধামতো জায়গা থেকে গুলী ছুঁড়ে মেরে ফেলতে,—একমাস-দু'মাসও লেগে যায়। আপনি থাকুন এখানে একমাস-দু'মাস। তারপরে, যদি ওরকম গুণাহ্‌ ও' আর ক'রে ফেলে, তখন আমিই ডেকে বলবো আপনাকে। এক কথায় ওকে মেরে ফেলবেন।

সাহেব চিন্তিত মুখে বললেন,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

উঠে দাঁড়ালাম ক্রাচ্‌টা হাতে নিয়ে। একটু এগিয়ে গিয়ে ওঁর একটা হাঁটুর ওপর আমার হাত রাখলাম, বললাম,—গুস্তাকী মাপ করবেন সাহেব, আমার এ-কথাটা আপনাকে রাখতেই হবে। আপনি কথা দিলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যেতে পারি।

—যাও ঘর।

—আপনি কথা দিলেন ?

সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—দিলাম। তবে, এর পরে যদি কারুর ক্ষেতে মুখ দেয়, তা হ'লে কিন্তু রাখতে পারবো না।

—জী সরকার, সেই কথাই মেনে নিলাম।

বলে চলেই আসছি, উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন,—মুন্নীকে একবার পাঠিয়ে দিও তো ?

মুখ ফিরিয়ে ব'ললাম,—জী। দেবো।

কিন্তু, বাড়ী এসে মুন্নীকে সে-কথা বলতে মুন্নী একেবারে 'তেলে-বেগুনে' জ্বলে উঠলো। বললে,—তোর শরম লাগে না ও-কথা বলতে ? নিজের জরুকে পরের কাছে পাঠাস ?

বলতে পারতাম,—'এ-তো আর নতুন নয় ?'—কিন্তু, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা আর বলতে পারলাম না। ওর চোখে-মুখে এমন একটা জ্বালা ফুটে উঠেছে, যাতে ক'রে ও-কথা আর বলা যায় না। বললে ওকে অনর্থক আঘাত দেওয়াই হবে।

চুপ ক'রে রইলাম। ও' রান্নাঘরে গিয়ে ভাত বাড়তে বাড়তেও সমানে গজ্ গজ্ করে চ'লেছে, এ-আমি ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম।

বাবুজী, আমার ঘরের দাওয়ার কাছটিতে সত্যিই একটা বড়ো জামগাছ ছিল, তার ফল হতো না কখনো, সেইজন্য গাছটার আদরও ছিল না। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর গাছের ছায়ায় খাটিয়া পেতে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি,—বাংলোর দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন সাহজলাল সাহেব নিজে। মুন্নী তখন ঘরে ছিল না, খাওয়ার পালা শেষ করেই জঙ্গলের দিকে গেছে কাঠ-কাটবা কুড়িয়ে আনতে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবকে বললাম,—আসুন সাহেব, বসুন। কী ভাগ্য !

সাহেবের মুখ গম্ভীর। আমার ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে ব'সে পড়লেন খাটিয়ায়। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমিও বোসো।

বসলাম আমি নীচে, মাটির ওপরে। উনি বললেন—ওখানে কেন?

অল্প একটু হেসে বললাম,—ঠিক আছে।

উনি দেশলাই জ্বেলে একটি সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—মুন্নী কোথায়?

বললাম,—জঙ্গলের দিকে গেছে, কাঠ কুড়োতে।

ভ্রূ-দুটো কুঁচকে উঠলো। বললেন,—কেন, কাঠ কুড়োতে কেন!

বললাম,—না গেলে চলবে কেন সাহেব? আমি তো আর রোজগার করতে পারি না, ওর রোজগারেই পেট চলে।

উত্তরে নিজের মনেই বিড়বিড় করে ব'লে উঠলেন,—তা'বলে কাঠ কুড়োনো কেন?

চুপ করে রইলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন,—বলেছিলে?

—হ্যাঁ, সাব্।

—কী বললে?

বললাম,—আপনার সঙ্গে দেখা করবার কথা তো? পরিষ্কার কিছু বললে না। ঔরৎ-লোগ্‌দের মর্জি বোঝা ভার!

—ও!—বলে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সাহজলাল। তারপরে, হঠাৎ-ই একসময় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—বাড়ী নেই যখন, তখন আর কী করা যাবে? এলে বোলো, আমি এসেছিলাম। দেখা যেন অবশ্যই করে।

—আচ্ছা, সাব্।

যেতে-যেতেও ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন—কাঠ কুড়োবার দরকার আর হবে না। বুঝিয়ে বোলো।

—আচ্ছা, সাব্।

মুন্নী ফিরে এলে আমি একে-একে সবই ব'ললাম ওকে। শুনে মুন্নী আগের মতোই ফোঁস্ ক'রে উঠলো। বললো,—কতো বড়ো সাহেব তোমার সাহজলাল, যে এসে ডাকলেই যেতে হবে? আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না।

—বলে গেছে, তোকে আর কাঠ কুড়োতে হবে না।

ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে। বললো,—ঈস্!—কী আমার দরদী রে! অতো দরদ দেখাতে বারণ ক'রে দিও।

বললাম,—সাহেব ভালো লোক। জুবেদা আর 'গুনাহ্' না করলে তাকে মারবে না বলেছে।

—ভারী বলেছে!—দোষ না করলে পোষা জানোয়ারকে কেউ গুলি করে মারে নাকি?

—তা' বাউরা জানোয়ারকে মারতে পারে, হুকুম আছে।

মুন্নী ঝংকার দিয়ে বললে,—জুবেদা বাউরা হোক যা-ই হোক, কার কী ক্ষতি করেছে শুনি? ঐ যে একবার একজনের ক্ষেতে মুখ দিয়েছিল, তুমি বারণ করবার পর আর কি সে-কাজ করেছে জুবেদা?

জুবেদা-সম্পর্কে মুন্নীর মুখে এই রকম দরদী কথা শুনে আমার চোখে জল এসে গেল। ব'ললাম,—তোমার কী মনে হয় জুবেদা আমার কথা শুনে চলবে?

—চলবে-চলবে-চলবে। ও' তোমাকে জান দিয়ে ভালবাসে!

আবেগে গলাটা আমার ধ'রে এলো। মানুষের কথায় মানুষ যে এতো সুখ পেতে পারে, তা' আমার জানা ছিল না। ওর হাতটা ধ'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনক্রমে বলে উঠলাম,—ভগবান তোমার ভালো করুন।

হাত ছাড়িয়ে নিলো। বললে,—তা' বলে, বাংলোয় আমাকে

যেতে বোলো না যেন। বাংলোয় যেতে আর আমি কিছুতেই পারবো না।

গেল না কিছুতেই। পরদিন সকালে সাহজলাল সাহেব একেবারে নিজেই এসে হাজির। মুন্নী তখন ঘরে ছিল। উনি আসতেই ওঁকে খাটিয়ায় বসতে দিয়ে আমি ডাকতে লাগলাম মুন্নীর নাম ধরে। মুন্নী আধময়লা একটা ছাইরঙের শাড়ী প'রে ছিলো, তাতে রান্নার হাত মুছতে মুছতে দাওয়ায় এলো। সাহজলালকে ঠিক বোধ হয় ও' আশা করেনি, তাই ওঁকে দেখে ও' থম্‌কেই দাঁড়ালো।

সাহজলাল ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললেন,—এই যে!

মুন্নী ছুটি হাত জোড় ক'রে বললে,—নমস্তে।

ব্যস্‌, তার পরেই ওর সামনে থেকে আড়ালে—ঘরের ভিতরে চলে গেল।

আমি বললাম,—দেখলেন তো সাহেব? জুবেদা আর কোনো 'গুনাহ্‌' করেনি, আর গিয়ে মুখ দেয়নি কারুর ক্ষেতে, কারুর অনিষ্ট আর করেনি। জুবেদা আমার কথা ঠিক শুনেছে। ঠিক কিনা বলুন?

সাহেবের কান নেই এ-সব কথায়। ঘরের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে, গলার স্বর একটু নামিয়ে ব'লে উঠলেন—মুন্নীর কী হয়েছে হে?

আমি আর কথা না ব'লে, একটু হেসে, চুপ ক'রে রইলাম। সাহেবও আর কোনো বাড়াবাড়ি করলেন না। চুপচাপ বসে বসে একটা সিগারেট্‌ ধরিয়ে, সেটা শেষ করে, মাঠের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, উঠে দাঁড়ালেন। তারপরে, পকেট থেকে একটা দশ-টাকার নোট্‌ খাটিয়ার ওপর রাখলেন। আমি অবাক হয়ে—সেই দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে বললেন,—ওকে দিও।

—সাহেব, ও-যে অনেক টাকা!

—তা-হোক, ওকে দিও।—বলে আর দাঁড়ালেন না, হন্‌হন্ ক'রে চলে গেলেন বাংলোর দিকে।

মুন্নী কিন্তু নিলো না সে-টাকা। বললো,—আবার এলে ফিরিয়ে দিও টাকা।

—বলছো কী!—বলে উঠলাম,—মানী লোক!

ঝংকার দিয়ে বললো,—ছাই মানী লোক! মানী লোক হ'লে কি আর জংলী একটা 'আওরৎ'-এর পিছনে অমন ঘুরঘুর করে?

বললাম,—আহা, ও-ভাবে বলছো কেন? এরা সব শহরের 'সাহেব', শহরের 'বাবু',—জঙ্গলে বসবাস করবার অভ্যেস নেই, জঙ্গলে এলে ওদের একা-একা লাগে,—তাই সঙ্গী চায়,—বুঝ্‌লে না?

বললো,—ছাই চায়,—তুমি আর বোঝাতে এসো না।

ওকে কাছে বসিয়ে ওর হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, কিন্তু এতে 'গোসা'ই বা করছো কেন? লোকটি কী খারাপ? যেমন জওয়ান, তেমনি লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা। এদিকে শিকারী, অথচ, শৌখীনও খুব। ওঁর ঘরে গিয়ে আমি সব দেখে এসেছি যে! আয়নার সামনে পাউডার-টাউডার সব সাজানো রয়েছে।

রুক্ষ গলায় ও' তবু বললো,—সে তুমি যা-ই বলো, ও-টাকা আমি ছোঁবো না, ভুখে মরলেও ছোঁব না।

বলতে-বলতে হাত ছাড়িয়ে নিলো আমার হাত থেকে, তারপরে উঠে চলে গেল।

আমি আর কী করবো? সেই ঝাঁকড়া-মাথা জামগাছটার নীচে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। শরীরটা আমার হঠাৎ আবার খারাপ হ'তে শুরু করেছে; পেটে একটা অসহ্য ব্যথা হয়। তখন একবার উপুড়, একবার পাশ-ফেরা—এম্‌নি ক'রে ক'রে কিছুক্ষণ কাটাতে হয়,—তারপরে ধীরে ধীরে ব্যথাটা ক'মে যায়। ক্রমে

যাবার পরও শুয়ে থাকতে হয়, খুব দুব্‌লা লাগে শরীরটা, বুকটাও ধড়ফড় করতে থাকে। কিন্তু, এ-ব্যাপারটা যদি ডেকে বলি মুন্নীকে, ও- আবার হৈ-হৈ করবে, অস্থির হয়ে উঠবে। তাই ডাকি না, জানতেও দিই না, নিজের ব্যথার কথা নিজের মনের মধ্যেই ঢাকা প'ড়ে থাকে।

বিকেল হয়ে এলে আস্তে আস্তে উঠে বসি। এদিক-ওদিক তাকাই। মুন্নী কাঠ কুড়িয়ে ফিরেছে হয়তো ভিতরে—ঘরে শুয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। আমাকে কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, 'জুবেদা' জঙ্গলের দিক থেকে ঠিক আগের মতই এসে হাজির হয়। ওর দিকে তাকাতে-তাকাতে, কী-জানি-কেন, চোখদুটি আবার সজল হয়ে আসে। ভাবি, 'ও-তো 'দিল্‌'-এর টানে ঠিক চলে আসে আমার কাছে—আমার এই ঘরের সামনে, কিন্তু, ও' কি জানে, ঐ একটু দূরে—বাংলো-বাড়ীটায় বন্দুক নিয়ে শিকারী এসে বসে আছে ওকে শেষ করবার জন্য? গুলি খেয়ে প'ড়ে যাবে মাঠের ওপর, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে,—আর ওর দাঁত কেটে নিয়ে 'রাজাবাহাদুর'-এর 'দফ্‌তর'-এ চলে যাবে শিকারী সাহজলাল রাজ্য-জয়ী বীরের মতো!

ওর কাছে গিয়ে ওকে আদর করতে লাগলাম। বললাম,—কারুর ক্ষেতে গিয়ে আবার যেন মুখ দিস না,—কেমন? আমার কথাটা মনে রাখিস, আমার কথাটা শুনে চলিস।

ভঙ্গী দেখে মনে হলো, আমার কথাটা ও বুঝ্‌লো। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েও রইলো। তারপরে 'আদুরে খুকী'র মতোই শুঁড় তুলে ডেকে উঠলো। অর্থাৎ, কই, এখনো আমাকে বাঁধছো না কেন, সুতো দিয়ে?

শুরু হলো আমাদের খেলা। বেড়ার ধারে ওকে বাঁধছি, আর বারবার বাংলোর দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু, কোথায় শিকারী সাহেব

এলেন না তিনি জুবেদার ডাক শুনেও। যাকে তিনি মারতে এসেছেন, তাকে একবার দূর থেকে দেখেও তো মানুষ!

একবার ভাবলাম, নিজেই বাংলোয় চলে যাই, সাহেবকে ডেকে দেখাই। কিন্তু ভয় হলো আমাকে না দেখতে পেয়ে জুবেদা যদি ক্ষেপে যায়! কথায় বলে,—জানোয়ারের মর্জি!

এই সব সাতপাঁচ ভেবেই আর গেলাম না ওঁকে ডাকতে। তবে, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভাবছিলাম, সাহজলাল যদি এসে পড়তেন, তো ভালো হ'তো; আমার জুবেদাকে একবার দেখাতে পারতাম, বলতে পারতাম,—দেখুন তো সাহেব, এ কি বাউরা?

কিন্তু, এলেন না তিনি। আপ্পানা একসময় বাংলো থেকে বেরিয়ে প্রায় আমার সামনে দিয়েই গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিল। পা-দু'খানা ওর রীতিমত টল্‌ছে। বুঝলাম—এখন ও' সুস্থ নেই। তবু ডাকলাম, বললাম,—সাহেব কি করছে রে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—কে, আব্বাসী?

—হ্যাঁ।

কী মনে করে এগিয়ে এলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সুর ক'রে বলে উঠলো,—

"জাহিদ্, সরাব পিনে দে মস্‌জিদমে বৈঠ কর্।
ইয়া য়ুও জগাহ্ বতা দে কি যাঁহা পর খোদা না হো।"

একটু অবাক হয়েই বললাম,—গানটা এর মধ্যে শিখে ফেললি কার কাছ থেকে?

জড়িত গলার স্বরে বললে,—শহরে গিয়ে দোস্তি করেছি সেই সরাবীর সঙ্গে। সরাবীর কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। কী? বলে দাও খোদা কোন্‌খানে নেই? যেখানে নেই, সেখানে চলে যাই বোতল হাতে। আর নয়ত, গোলমাল ক'রো না, মস্‌জিদে বসেই আমি সরাব চালাই।

বলে ফেললাম,—খোদা যদি সব জায়গাতেই থাকবেন, তা'হলে এত পাপ কেন? দুঃখ কেন? কান্না কেন?

ও আবার হাসলো হো হো করে। বললে,—পাপ কোথায়? দুঃখ কোথায়? কান্না কোথায়? নিমকহারাম! সব নিজেরা তৈরী ক'রে অন্যের নামে দোষ দিচ্ছিস্? আমার কাছে শোন্,—ও পাপও নেই, দুখ্‌ভী নেই, 'রোনা'ভী নেই! তুই যদি 'সাদা'কে 'সাদা' না দেখে, 'হল্‌দে' দেখিস্, সেকি খোদার দোষ? কভী নেহি।

বলতে-বলতে চলে যাচ্ছিল সে। আমি আবার ডাকলাম, বললাম,—সাহেবের খবর কী? বেড়াতে বেরুলো না?

আপ্পানা বললে,—সাহেবের মেজাজ খারাপ। বুড়ো খানসামাটা গাঁ থেকে একটা জংলী আওরৎ নিয়ে এসেছিল, তাকে দেখে সাহেবের পছন্দ হয়নি; তাকে একটা টাকা দিয়ে 'দূর-দূর' করে তাড়িয়েছে, আর তারপরে 'গন্ধি জবান্‌সে' গাল্‌ দিচ্ছে আমাদের!

বুড়ো খানসামা মানে, মুন্নীর বাবা। ওর কথা উঠতেই আমি চুপ করে গেলাম। আপ্পানা আবার সুর করে 'জাহিদ, সরাব পিনে দে'—গাইতে গাইতে গাঁয়ের পথে চলে গেল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হলো। জুবেদাকে ছাড়িয়ে দিলাম সুতোর বাঁধন থেকে; হেলে দুলে যেমন চলে, তেমনি জঙ্গলের দিকে চলে গেল জুবেদা। সাহজলাল সাহেব তখনো এলেন না।

এলেন একেবারে পরের দিন সকালবেলা। হঠাৎ মেঘ করে জল এলো। মাঠের ঘাসপাতা, আর বনের ডালপালাগুলোকে রীতিমত ভিজিয়ে দিয়ে বর্ষা চলে গেল। আকাশের গায়ে আফ্‌তাব বা সূর্যি আবার হেসে উঠলো। তখন আমাদের বৃষ্টিভেজা জাম গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালেন সাহজলাল। তার মানে, এমন একটি সময়ে,—যখন মুন্নী ঘরে থাকতে পারে। এটা অবশ্যি ওঁরই আন্দাজ।

বললাম,—মুন্নী আপনার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, সাহাব!

—কেন ?

দশ টাকার নোটখানা বার করে বললাম,—এই নিন। আপনার টাকা সে ছুঁতেই চায় না।

একটুক্ষণ থেমে থেকে কথার ভাবটা ভালো করেই ভেবে নিলেন বুঝি। তারপরে, মুখ তুলে ঘরের দরজার দিকে তাকালেন একবার। বললেন, —বেশ। মুন্নী তো ঘরেই আছে ? তাকে বোলো, টাকা ফিরিয়ে দিলেও 'পেয়ার' ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

বলেই, হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন বাংলোর দিকে। পিছন ফিরে একবার তাকালেন না পর্যন্ত।

আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে দাওয়ায় ছুটে এলো মুন্নী। রাগে সে গর্‌গর্‌ করছে। বললে,—পেয়ার! পেয়ার অতো শস্তা ? তারপরে, বাবুজী, কয়েকটা দিন ধ'রে এই ব্যাপারই চল্‌তে লাগলো। সাহজলাল সাহেব আসেন শুধু সকালের দিকে। সে সময় সত্যিই ঘরে থাকে মুন্নী। কিন্তু, কক্ষনো ওর সামনে বেরোয় না। সাহেবের অবস্থা দেখে আমারও 'তুখ' হয়। ক্রাচ্‌-এ ভর দিয়ে ভিতরে যাই, ওকে ডেকে বলি,—যাও না ? একটা কথাই বলো না গিয়ে।

মুখ ঝামটা দিয়ে বলে,—না।

রাগ করে বলি,—মিছিমিছি এত কষ্ট সইছো, মিছিমিছি প'ড়ে আছো এই ভাঙা-শরীর খোঁড়া মানুষটিকে নিয়ে। কী লাভ হচ্ছে তোমার, শুনি ?

দাঁতে দাঁত চেপে থেকে, তারপরে চাপা গলায় সাপিনীর মতো হিস্‌-হিস্‌ একটি আওয়াজ তুলে বললে,—কী লাভ হচ্ছে-না-হচ্ছে, সে আমি বুঝবো,—তোমার কী ? বলেছো না তুমি আমাকে,—আমি স্বাধীন ?

রান্নাঘরে চলে গেল মুন্নী, আর আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপরে বাইরে এলাম। সাহেব দেখি তখনো মাথা নীচু ক'রে বসে আছেন খাটিয়ার ওপরে, জাম গাছের নীচে।

কাছে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। বললাম,—সাহেব, ও' এলো না। কেন আস্‌তে চায় না, তাও বুঝি না।

—ঠিক আছে, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।—বলে, উঠে চলে গেলেন সাহেব।

আমি ওঁর জায়গায় বসলাম, খাটিয়ায়। মনে কোনরকম চোট্‌ পেলে আমার কেমন যেন দুব্‌লা দুব্‌লা লাগে আজকাল। কিন্তু কথা হচ্ছে, মনে আমার চোট্‌ লাগলো কখন? মুন্নী সাহজলালের কাছে যাচ্ছে না, আমাকেই আঁক্‌ড়ে ধ'রে আছে, দুঃখকষ্ট ক'রে আমারই সঙ্গে দিন গুজরান করছে,—এতে তো আমার দিল খুশ্‌ হবারই কথা। কিন্তু, তার বদলে বুকের ভিতরে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে-দিয়ে ওঠে কেন? দুনিয়ার মালিক, যিনি মানুষের মধ্যে 'মন' ব'লে জিনিষটার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন এ'কথা। দীন সাহেব বলতেন,—মন হচ্ছে এমন একটা জিনিষ, যার সঙ্গে ভগবানের লীলা চলে,—যেন আলোয়-আলোয় কথাবার্তা! আমরা আমাদের মনের মালিক হয়েও মনের খবর সঠিক জানতে পারি না।

কিন্তু' থাক সে কথা। যে কথা বলছিলাম, সে কথাটাই শেষ করি। সকালে সাহজলাল আসেন, কিন্তু, বিকেলে আসেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন,—সময় পাই না!

বলি,—জুবেদাকে তো এক দিনও দেখলেন না সাহেব?

উত্তরে অল্প একটু হেসে বলেন,—দেখে কী করবো? তোমাকে যে 'জবান্‌' দিয়েছিলাম, তা' আমি রেখেছি।

বলেই চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। যে দৃষ্টিতে এমন একটা-কিছু ছিল যাতে ক'রে আমার শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত খেলে গেল মুহূর্তে। আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ওঁর ঐ দৃষ্টির কারণটা। মনে হলো, উনি বলতে চান,—আমার কথা আমি রেখেছি, কিন্তু, তোমার কথা?

আমার 'জবান্' ছিলো জুবেদার ব্যাপার নিয়ে। অথচ মনে হলো, সে জবানের কথা উনি বলতে চাইছেন না। ব'লতে চাইছেন অন্য এক জবানের কথা, যেটা আমি উচ্চারণ না করলেও মনে মনে বুঝি সায় দিয়ে এসেছিলাম। উনিও স্পট করে কথাটা বলেননি, আমিও স্পট করে সেসব বিষয়ে কিছু তুলিনি। অথচ, দু'জনের মধ্যেই যেন একটা অকথিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল,—আমিও জুবেদাকে মারবো না, তুমিও আমার হাতে তুলে দাও তোমার মুন্নীকে। তুমি তো 'বরবাদী' মানুষ, দুনিয়ায় তুমি বরবাদ হয়ে গেছো, এখন আর মুন্নীকে ছেড়ে দিতে তোমার বাধা কী?—

কিন্তু, বাবুজী, ওঁর কথার জবাবে আমি তো স্পট করে এ প্রসঙ্গ তুলতে পারি না! তাই, জুবেদার কথা এনেই মনের ভাবটা যতদূর সম্ভব প্রকাশ করতে হয়। বললাম,—জুবেদা আর কারুর ক্ষেতে মুখ দেয়নি, আমার কথা ও' শুনেছে। লেকিন সাহাব, যে আপনার বন্দুকের শিকার হয়েছে, যাকে আপনি যখন-খুশী মারতেও পারেন, রাখতেও পারেন,—তার ওপর তো আপনার সঙ্গে-সঙ্গেই 'হক' এসে গেছে জুবেদার আসল মালিক এখন আপনি, আমি খিদ্‌মদ্‌গার আছি 'নাম-কো-ওয়াস্তে'।

সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট-ছোট ক'রে কথাগুলো মন দিয়েই শুনলেন। মনে হলো, বুঝতে পেরেছেন আমি কী বলতে চাই। অথচ, আমার মতো উনিও দেখলাম স্পষ্ট হ'তে পারলেন না। বললেন,—শহর থেকে আমিন একটা 'খৎ' পাঠিয়েছে; জানতে চেয়েছে, বাউরা 'কুমকী'টা শেষ হয়েছে কিনা। আমি এখনো কোনো জবাব দেই নি।

—লেকিন সাহেব, জবাব তো দিতেই হবে একদিন।

সাহেব বললেন,—দেবো বই কী। দরকার হলে, একেবারে খাস 'দেওয়ান'সাহেবকে লিখবো—হাতিটা বাউরা হয়নি, এরা মিছিমিছি কথাটাকে রটিয়ে দিয়েছে।

বললাম,—না সাহাব, আমিন আর মুন্‌সী নিজেরাই দেখে গেছে জুবেদাকে। তারপরে মাহিনা শেষ হলে, ওরা সবার 'তলব' দিতে আসবে। তখনো তো দেখে যাবে 'জুবেদা'কে? আপনার কথা 'বিশোয়াস' করবে না।

সাহজলাল সাহেব নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপরে হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন,—আচ্ছা আব্বাসী, তোমার 'পা' যে গেল, তার জন্য টাকা দিয়েছে ওরা?

—না।

—কেন?

বললাম,—জানিনা সাহাব। কতো 'দরখাস্ত' করেছি, আমিন-মুন্‌শীরা এলে, কতো ওঁদের হাতে-পায়ে ধ'রেছি, তবু টাকা আসে নি।

—কী বলে ওরা?

বললাম,—ওঁরা তো যে ক'বার এসেছেন, সে-ক'বারই বলে গেছেন, টাকা ঠিক আসবে একদিন-না-একদিন। আমি কিন্তু ভরসা ছেড়ে দিয়েছি।

সাহেব বললেন,—সে-ও ঐ আমিন আর মুন্‌শীরই হাত। ওরা যখন-খুসী দিতে পারতো, এত দেরী হবার কথাই নয়। তুমি সহরে আমাকে 'খৎ' লিখতে পারলে না? আমাকে কি চিনতে না তুমি?

বললাম,—চিনবো না কেন হুজুর? তবে ঠিক—

—ভরসা পাওনি—কথাটা কেড়ে নিয়ে উনি বললেন,—ঠিক আছে, শহরে গিয়ে আমি নিজে এবার দরবার করবো।

বুকের ভিতরটা আবার কেমন-যেন ক'রে উঠলো ওঁর কথায়। কোনক্রমে বললাম,—বলছেন কী সাহাব, আপনি এতটা করবেন আমার জন্য!

উঠে দাঁড়ালেন সাহজলাল। ধীরে ধীরে বললেন,—তোমার জন্য নয়, মুন্নীর জন্য আমি সব করতে পারি।

উনি চলে যেতেই মুন্নীকে আমি বললাম কথাটা। মুন্নী বললে,—তোমারও যেমন! বিশোয়াস করো ওদের কথায়? ওরা খেলা করতে আসে। খেলা যতদিন করে, ততদিন 'স্বর্গ' তুলে দেয় হাতে। খেলা যেদিন ভাঙে, সেদিন আর ফিরেও তাকায় না। জংলীদের আমার হাড়ে-হাড়ে চেনা হ'য়ে গেছে।

রাগ করে বললাম,—ভদ্দর মানুদের তুই-ও 'জংলী' 'জংলী' বলবি?

বহুৎদিন পরে আমি ওকে 'তুই' করে কথা বললাম বাবুজী। ও' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। একটু হাসলোও বুঝি—তার পরেই চলে গেল আর কোনো কথা না ব'লে।

লক্ষ্য করে দেখলাম, সাহজলাল সাহেবের কথাটা ওর মনে একটুও দাগ কাটে নি। দুপুর একটু বেশী হ'তে-না-হতেই রোজ যেমন চলে যায় জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে, তেমনি চ'লে গেল। ফিরতে-ফিরতে যেমন সন্ধ্যে হয়, তেম্নি সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে, সেই কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে ও-যে ভিন্ গাঁয়ে চলে যায় ব্যাপারীদের কাছে। সেখানে ঐ কাঠ-কাট্‌রা বিক্রী করে, তারপরে ঘরে আসে। সাহজলাল সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তাই বিকেলে, এত করে বলা সত্ত্বেও, কখনো আসেন নি।

নিয়ম ক'রে যে রোজ বিকেলে আসে, সে জুবেদা। তার রোজকার খেলা কিন্তু ঠিকই বজায় আছে। অথচ, আমার ঘরে আর আমার মনে, যে সর্বনাশা খেলা শুরু হয়েছে,—তার শেষ হবে কবে?

যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন সন্ধ্যে হতে-না-হতেই আকাশ কালো ক'রে ভীষণ ঝড়-জল নামলো। মুন্নী ততক্ষণে ফিরে এসেছে, এই যা' রক্ষে। নইলে, এই বৃষ্টিতে ভীষণ বিপদে পড়তো। ও' এসে বললে,—ভাবছো কী? জুবেদার কথা?

বললাম,—সে তো ভাবছিই। এই ঝড়-জলে কোন্ গাছের তলায়

গিয়ে দাঁড়ালো কে জানে! গাছ ভেঙে প'ড়ে ওর গায়ে-মাথায় না 'চোট্' লাগায়।

মুন্নী মুখ ভার করে বললে,—তোমার খালি জুবেদা আর জুবেদা। জানোয়ারের ভয় জঙ্গলে? লোকে শুনলে হাসবে যে?

তারপরেই,হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে দু'হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে বললো—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?

—কী?

বললো,—চলো না কোথাও চলে যাই! কোনো বাগান-টাগানে। আমি খাট্‌বো, পয়সা আনবো। দুটো মানুষের পেট চলে যাবে না? জবাবে কথা বলতে গিয়ে গলাটা ধ'রে এলো। বললাম,—তোমার খাট্‌নীর পয়সা তো এখানেই খাচ্ছি। কিন্তু, মুন্নী, আমি জুবেদাকে ছেড়ে থাকবো কী করে?

ও অল্প একটু হেসে আমার কাঁধের ওপর ওর চিবুকটা রাখলো, তারপরে বললো,—আমি তা জানি। তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখ্‌ছিলাম। 'জুবেদা' তোমার পেয়ারের, আমার পেয়ারের নয়?

তখন আর কথা হলো না। কথা হলো রাত্তিরে। বৃষ্টিটা মাঝে থেমে গিয়েছিলো, আবার এলো ঝম্‌ঝম্ ক'রে। মাথার ওপরে, ঘরের চালে বৃষ্টি পড়ার একটা একঘেয়ে আওয়াজ হচ্ছে। সেই একঘেয়ে আওয়াজ যেন আমার বুকের ভিতরেও ঝংকার তুলতে চায়! ওকে কাছে ডেকে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম,—দেখ মুন্নী, একটা কথা আজ তোমাকে বলবো।

ও' আমার বুকের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি কথা-বলার সুরে বললে,—একটা কথা কেন, হাজারটা কথা বলো। আমি ঘুমোবো না, স-ব শুন্‌বো।

বললাম,—তোমার এই 'কুরবানি' আর ত্যাগ দেখে যেমন দিনের পর দিন অবাক হচ্ছি, তেমনি তা' আমাকে দিনে দিনে—মুহূর্তে-মুহূর্তে

'ছোটো' করে দিয়ে যাচ্ছে। আমার তো আজ দেবার কিছু নেই, এম্নি ক'রে শুধু নিয়েই যাবো?

ও' মুখ তুললো। দেখতে-দেখতে ওর দুটি চোখ ভ'রে উঠলো জলে। বললে,—কিন্তু, যেদিন তুমি শুধু দিয়েই গেছো, নাওনি কিছু,—সেদিন?

বললাম,—তারই 'বদ্‌লা' দিচ্ছো আজ?

মুন্নী ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি টেনে আনলো, তারপরে বললো,—তাই-ই মনে করো।

কিন্তু বাবুজী, সময় যায়, দিন যায়,—দিনে দিনে, লহমায়-লহমায়—কতো আর সহ্য করতে পারে মানুষের মন? ভালবাসারও একটা ভার আছে বাবুজী। সে-ভার সইবার মতো 'তাগদ্‌' আর আমার মনের নেই। রোজ সকালে সাহজলাল সাহেব আসেন, আর রোজই তিনি ফিরে যান। ও'সামনে আসে না, কথাও বলে না। ব্যাপারটা চুপচাপ চেয়ে-চেয়ে দেখি, আর বুকের ভিতরটা গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠে। একদিন থাকতে না পেরে মুন্নীকে রাগ ক'রেই বলে উঠলাম,—তোমাকে যেতেই হবে সাহজলালের কাছে।

আমার অমন রাগ দেখে একটু অবাকই হলো মুন্নী প্রথমটায়। তারপরে একটু শ্লেষের সুরেই বললে,—যেতেই হবে?

—হাঁ।

আমার গলার স্বরে যে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো, সেটা লক্ষ্য করলো মুন্নী। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটি চেপে ধ'রে ওর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কী যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললো,—বেশ, তোমার কথায় রাজী হতে পারি, যদি সে অনেক টাকা দেয়। অনেক টাকা, বুঝেছো? সেই টাকা দিয়ে তোমাকে বড়ো সহরে নিয়ে গিয়ে তোমার আমি চিকীৎসা করাবো ভালো ক'রে।

অল্প একটু হেসে বললাম,—পাগ্‌লী কোথাকার! কী চিকীৎসা

করাবি ? ফিরে পাবো আমার এই কাটা পা ? টাকার অবশ্যি দরকার। তোর নিজের জন্যই দরকার। দু'বেলা খেতে পাস তা'হলে ভালো ক'রে। কী চেহারা হয়ে গেছে! সেই মুন্নী ব'লে আর চেনা যায় ?

মুন্নীর ঠোঁটে ফুটে উঠলো অদ্ভুত হাসি। বললে,—তবুও সাহজলালের মত লোকেরা এখনো পিছু-পিছু ঘুরঘুর করে!

—করুক।

এই প্রসঙ্গেরই জের টেনে পরদিন ওকে সকালে সাহজলালের কাছে বার করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই বেরুলো না। শুধু বললে,—এসে ঠিক হাজির হয়েছে বুঝি ?

—ওর আর দোষ কী বল্ ?

বললে,—খুব যে তুই-তোকারি আরম্ভ করেছো, ব্যাপারটা কী ?

হেসে বললাম,—আগের মুন্নীর মতো লাগ্‌ছে তোকে আজ।

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। বললাম,—হলো কী ? কাপড়টা বদ্‌লে একটা ভালো কাপড় পর্। ওর সামনে যা।

চোখ দুটো ওর যেন জ্বলে উঠলো, ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো,—যাবো না—যাও! কী করতে পারো তুমি ?

বললাম,—কাল রাত্তিরে যে কথা দিলি ?

ও' আমার চোখের দিকে তাকালো। বললে,—বেশ। তাই হবে। কিন্তু, আগে জিজ্ঞাসা করো দেখি, আমাকে অনেক—অনেক টাকা দেবে কিনা ?

বললাম,—জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমি জানি। তোকে ওর 'না-নেবার মতো' কিছু নেই। যা চাইবি, তা-ই দেবে।

ও বললে,—তা' বলে এখন নয়। এখন যেতে বলো।

খুসী হয়ে বললাম,—ঠিক আছে। তাই গিয়ে বল্‌ছি। সন্ধ্যের যাবি ত ?

বাবুজী, 'আওরৎ-লোগ-এর দিল্ বোঝা ভার' বলে একটা

কথা আছে না? কথাটা ঠিক। এর জবাবে ও কী করেছিল, জানেন? অরেও কাছে এগিয়ে এসে আমার গালে মারলো ঠাস্ ক'রে একটা চড়! এই ডান গালটার, ঠিক এইখানে। সেই জ্বালা বোধ হয় এখনো লেগে রয়েছে!

তারপর, শুনুন? চড়টা মারলো, আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললো,—তাই যাবো-তাই যাবো।

বলতে-বলতে, দুটি হাতে মুখ ঢেকে চলে গেল পাশের ঘরে। গিয়ে ভিতর থেকে খিল দিয়ে দিলো।

আমি চড় খেয়ে অতি কষ্টে 'পড়ে-যাওয়া' থেকে সামলে নিয়েছি নিজেকে। তারপরে, প্রায় টলতে-টলতেই বাইরে এসে দেখি, খাটিয়াটা খালি, সাহজলাল চলে গেছেন। আমাদের কথাবার্তার কতটুকু কানে গিয়েছিল কে জানে!

তবে আমার 'নসীব' ভালো, মুন্নী আর বেঁকে দাঁড়ালো না, আমার কথা শুনলো। দুপুরে আর বেরুলো না কাঠ-কাটুরা কুড়িয়ে আনতে। ঘরেই শুয়ে-বসে সময় কাটালো। বিকেলে, দাওয়ায় উঠে এসে আমার আর জুবেদার খেলা দেখলো। তারপরে, সন্ধ্যের পর 'গোসল' সেরে এসে, বাক্স খুলে শাড়ী বার করলো, চুল আঁচড়ালো, চুল বাঁধলো ফিতে দিয়ে, মুখে পাউডার ঘসলো, ঠোঁট রাঙালো, কপালে পরলো কাঁচপোকার টিপ, তারপরে, যেমন আগেকার দিনগুলিতে যেতো, তেমনি হেল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে গেল বাংলোতো। আমি একা, জুবেদা চলে গেছে, 'গুণ্ডা'রা হাতিশালায় ব্যস্ত, কিম্বা, সহরে-টহরে গেছে। সঙ্গীহীন খাটিয়ায় শুয়ে আমি আকাশের তারা দেখছি, কিন্তু মনটা কেমন যেন 'ঝিম্' ধ'রে আছে। খুশীও হয়েছে, আবার ব্যথার সুরও যেন বাজ্‌ছে।

কিন্তু কতক্ষণ, বাবুজী? সে-রাত্তিরে বাংলোর দিকে চলে যাবার একটু পরেই ফিরে এলো মুন্নী, হাঁপাতে-হাঁপাতে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে। এসে একেবারে আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বলা যায়। কান্না ভরা গলায় বলে উঠলো,—আমি পারবো না—কিছুতেই পারবো না!

তাড়াতাড়ি ওকে ধ'রে উঠে বসলাম। বললাম—কী হলো, মুন্নী?

খাটিয়ায় আমার পাশে বসে পড়েছিল। দু'হাতে মুখখানা ঢেকে মুন্নী ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো, তারপরে বললো,—ও' আমাকে শুধু নয়, আমার 'পেয়ার' চায়—পেয়ার—ভালোবাসা! তা' আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।

আমি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম, কিছু বলিনি। ও' নিজেই কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে একসময় চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে, আমারই মতো তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল,—যে দুনিয়ার মালিক আমাকে-ওকে, জুবেদাকে আর সবাইকে সৃষ্টি করেছে,—সেই মালিকেরই তৈরি-করা বিশাল আকাশটাকে। সে রাত্তিরে চাঁদ ওঠে নি, কিন্তু, তারায়-তারায় সারা আকাশটা একেবারে ভ'রে আছে!

পরদিন। সকালবেলা। সেই যে প্রথম দিন গিয়েছিলাম বাংলোয়, তারপরে আর যাইনি। সেদিন আবার চলেছিলাম ধীরে ধীরে—ক্রাচে ভর দিয়ে,—সাহজলাল সাহেবের কাছে।

—সাব্‌?

—আব্বাসী?

—হ্যাঁ।

—ভিতরে এসো।

পর্দা ঠেলে ভিতরে গিয়ে কুর্শিতে বসেছিলাম সেই প্রথম দিনটির মতোই। বলেছিলাম,—সাহাব, জোর-জবরদস্তি করবেন না। ওর

মনে ধীরে ধীরে পেয়ার জাগিয়ে তুলুন। ও' এই অকেজো, পা-কাটা, ভেঙে-পড়া মানুষটাকে নিয়ে নেশায় পড়ে গেছে। লেকিন, এ-নেশা তো ভাল নয়, সাহাব! এতে ক'রে দিনে দিনে ও' যে ম'রে যাবে। ওর সেই রূপ কী আর আছে, যা ওর ছিল? দেখে-দেখে আমারই কষ্ট হয় সাহাব। আপনি ওকে 'পেয়ার' দিয়ে—ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিন। 'আওরৎ'-এর মন দরিয়ার স্রোতের মতো, যে দিকে নিপুণ হাতে বহাতে পারবেন, সেই দিকেই বইবে। একটা কথা বলি। রোজ পড়ন্ত দুপুরে ও' যায় জঙ্গলে, কাঠ কুড়োতে। সেখানে গিয়ে রোজ রোজ ওর সঙ্গে দেখা করুন আপনি। 'মিঠা-মিঠা বাত্‌চিত' বলুন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন সাহজলাল সাহেব, চোখের পলক যেন আর পড়তেই চায় না!

তারপরে, একসময় চমক্ ভেঙে চোখটা নামালেন একবার। বললেন, —কিন্তু, তাই যদি হয়, তবে, তুমি যে ওকে হারাবে, আব্বাসী?

বললাম,—হারাতেই হবে। আমি ত মৃত্যুর শিকার হয়েছি, কোন্‌ দিন চোখ বুজবো তার ঠিক নেই,—আমার সঙ্গে সঙ্গে ও'-ও কেন ক্ষয় করবে নিজেকে?

সাহজলাল চুপ ক'রে রইলেন, আর কিছু বললেন না আমাকে।

মনটা, সেদিন আমার অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গিয়েছিল বাবুজী। ক্রাচে ভর দিয়ে ঘরে ফিরে আসছিলাম, আর মনে মনে ভাবছিল দুনিয়ার মালিক 'ভোগ' কেড়ে নিয়েছেন বটে, 'ত্যাগ' তো দিয়েছেন? আমি মৃত্যু পথের যাত্রী, ভোগ করবার মতো আমার আর আছে কী? কিন্তু না,—আছে। 'কুরবানি' করবার মতো মন তো আমাকে দিয়েছেন মালিক। ভোগ যার শেষ হয়ে যায়, ত্যাগই তার ভোগ। তাই ভাবলাম, ভোগে পারলাম না, ত্যাগে আমি ছাড়িয়ে যাবো সবাইকে।

কিন্তু, বাবুজী, দুনিয়ার মালিক সেদিন আমার মনের কথাটা

শুনে মনে মনেই হেসেছিলেন। তাই যে ব্যাপারটার কথা এক লহমার জন্ম ভাবতে পারি নি, তা-ই ঘটে গেল একদিন।

মুন্নীর জঙ্গল থেকে ঘরে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। তারপরে রোজই ভাবি, এইবার ও সাজতে বসবে। এইবার ও' বাক্স খুলবে, পছন্দমতো শাড়ী বার করবে, মুখে পাউডার দেবে, চোখে কাজল দেবে, ঠোঁট রাঙাবে, কপালে পরবে কাঁচপোকার টিপ,—তারপরে ঠোঁটের কোণে লাজুক-লাজুক হাসি নিয়ে দাঁড়াবে এসে আমার কাছে। ফিস্‌ফিসিয়ে বলবে,—আমি যাই ?

কিন্তু, কোথায় কে ? ও' সাজেও না—কিছুই না, ঘরের কাজ নিয়ে মেতে ওঠে, রান্না করে, তারপরে আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। সাহজলালের কথা ও'-ও ওঠায় না, আমিও তুলি না। বরং, সে-কথা না এসে পড়ে, সেদিকে হুঁসিয়ার হয়ে থাকি।

কিন্তু অবাকও হই। সাহজলাল দুপুরে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়ে,—এ-আমি খবর পেয়েছি। 'গুণ্ডা'ই এসে একদিন খোঁজ দিয়ে গেল। বললে,—ব্যাপার কী ? মুন্নী কি আবার খেলা শুরু করেছে ?

—তা'হলে তো বেঁচে যাই।

—কেন ?

ওকে কাছে ডেকে বসিয়ে ওর হাত ধরে বলি,—দোস্ত, আমি 'মৌত'-এর শিকার। আমার দিক থেকে মন ফিরে যদি ঐ দিকে ওর মনটা বসে যায়, তাহলে ও' বেঁচে উঠ্‌বে। ও' জঙ্গলে থাকলেও জঙ্গলের মেয়ে। নয় সেজে গুজে যখন ও' বেরোয়, দেখেছিস ওর রূপ ? শহরের 'আচ্ছা-আচ্ছা খাপ্‌ সুরৎ লেড়্‌কী'কে ও' হারিয়ে দিতে পারে।

—ও, বুঝেছি !—বলে, গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ায় 'গুণ্ডা'।

—রাগ করলে, দোস্ত ?

—না।—বলে, মাথা নীচু করে ও চলে যায় হাতিশালার দিকে।

আমি বসে-বসে সাহজলাল সাহেবের কথাই ভাবি। অমন লম্বা-চওড়া চেহারা, অমন গায়ের রঙ, অমন শৌখীন পুরুষমানুষ—একটি মেয়েকে জয় করতে ওর এতো দেরী হচ্ছে ? মুন্নীর ভাবভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারি, ওর 'পেয়ার' এখনো পায়নি সাহজলাল। এখনো ওর মন ভেজাতে পারেনি সে।

পারেনি বটে, তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে মনে-মনে খুশী হয়ে উঠতাম আমি। যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মুন্নীর 'তন্দুরস্তী।' বৃষ্টি-ভেজা বনের পাতার মতো আবার যেন সতেজ হয়ে উঠছে মুন্নীর শরীর। আবার ধীরে ধীরে আগের মতোই 'খাপসুরুৎ' হয়ে উঠছে ও'। জানি না, আমার চোখের ভুলও হতে পারে। তবে, একটা কথা বাবুজী,—আমার মন কি এতে শুধু 'খুশ্'ই হতো ? মনের কোণে কোথাও কি 'নফ্রৎ'-এর কালো রেখা আঁকা পড়েনি ? নইলে, যে-ঘটনাটা হঠাৎ একদিন ঘটে গেল, সেটা ঘটলো কেমন করে ?

সেদিন বিকেল হয়ে গেল, দাওয়ার কাছে চুপচাপ বসে আছি, অথচ, জুবেদার দেখা নেই! আর, দেখা নেই বলেই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছি। ঘরে কেউ নেই, আশেপাশেও কেউ নেই, বাতাসটা কেমন যেন হঠাৎ থম্থমে হয়ে আছে সেদিন। আকাশের কোণে সূয্যি ডুবে যাচ্ছেন, আকাশটা লাল হয়ে আছে রোজকার মতো,—কিন্তু সেদিনকার 'লাল'-ভাবটা যেন ভালো লাগছে না! মনটা আমার বড়ো উস্খুস্ করতে লাগলো। একবার মনে হলো, চেঁচিয়ে আপ্পানাকে ডাকি, নয়তো 'গুণ্ডা'কে ; কিন্তু গলা দিয়ে স্বর যেন ফুটতেই চায় না! কীসের একটা অজানা ভয় এসে যেন আমার গলাটা সজোরে চেপে ধ'রে আছে!

মনের এই অবস্থায়, হঠাৎ এক সময় শুনতে পেলাম, আচম্‌কা একটা চীৎকার। কে যেন কোথায় হাহাকার করে উঠলো! নিজেই বুঝতে পারছি না, ঠিক কী হলো। সত্যিই কেউ চীৎকার করলো, না—আমার মনের চীৎকার?

কিন্তু পরক্ষণেই আমার সন্দেহ ঘুচে গেল। শুনতে পেলাম, জঙ্গলের দিক থেকেই, দুম্‌-দুম্‌ শব্দ। বন্দুকের আওয়াজ! একটা নয়, দুটো নয়, পর পর চারটে।

ভয়ে, আশঙ্কায়, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছি। পাগলের মতো চীৎকার করছি,—মুন্নী—মুন্নী!

কিন্তু, পরক্ষণেই মনে হলো, মুন্নীকেই বা এমন করে ডেকে উঠলাম কেন?

ডাকা উচিত ছিল জুবেদাকে। জুবেদা কারুর কোনো ক্ষতি করে নি তো?

এই সব মুহূর্তে ভেবে নিয়ে, 'জুবেদা' বলে ডাকতে যাচ্ছি, কিন্তু, গলার স্বর ফুটছে না, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, হাতের 'ক্রাচ'টা বুঝি আলগা হয়ে পড়ে যায় হাত থেকে!

সামলে নিয়ে 'জুবেদা' জুবেদা' বলে আবার ডাকতে থাকি,—এমন সময় গাছপালা-বেড়া-সব ভাঙতে ভাঙতে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো জুবেদা।

কিন্তু, কী দেখলাম! এই দেখবার জন্যই কি দুনিয়ার মালিক আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন? জুবেদার একটা চোখ দিয়ে গল্‌-গল্‌ করে রক্ত পড়ছে! শুঁড়ের ঠিক মাঝখানটা থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে! আর তারপরে শরীরের আরও দুটো জায়গা থেকে!

লহমায় বুঝতে পারলাম, নিপুণ শিকারী ঠিক-ঠিক জায়গাতেই গুলি বিঁধিয়েছে। জুবেদা আর বাঁচবে না!

কিন্তু, জুবেদা টলতে-টলতে এগিয়ে এলো, চালের বাতা থেকে

লাটাইটা বার করতে চেষ্টা করতে লাগলো। আমি ততক্ষণে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছি,—জুবেদা! শিকারী তোর এ-কী দশা করেছে! তার সঙ্গে কী কথা ছিল আমার! যদি ক্ষতিই করে থাকিস কারুর, তবে আমাকে সাহজলাল-সাহেব একবার সে-কথা বললেনও না! তার আগেই তোকে এমন করে শেষ করে দিলেন!

জুবেদা লাটাইটা খুঁজছে, কিন্তু শুঁড়টা ভালো করে তুলতে পারছে না। আমি ওর কাছে সরে গিয়ে লাটাইটা বার করলাম। ও' একবার ডাকবার চেষ্টা করলো, কিন্তু গলায় সেরকম স্বর ফুটলো না।

টল্‌তে টল্‌তে যে খুঁটিতে ওকে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখতাম, সেই খুঁটির কাছ ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ালো।

যেন বল্‌তে চায়,—আমাকে কে যেন জোর করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি আমাকে শিগ্‌গির বেঁধে রাখো!

আমি তাই-ই করলাম। লাটাইয়ের সুতো নিয়ে যেমন ক'রে ওকে বেঁধে রাখবার খেলা খেলতাম, তেমনি ক'রে ওকে বেঁধে রাখার শেষ খেলা খেলতে গেলাম! কিন্তু কতক্ষণ ও' দাঁড়িয়ে থাকবে? ও' আর দাঁড়াতে পারলো না, পড়ে গেল বাবুজী!

আমারই চোখের সামনে, আমার পায়ের কাছ পর্যন্ত কোনোক্রমে শুঁড়টা এগিয়ে দিয়ে ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো!

কিন্তু তারপরেই এলো ওরা। বহু লোকজন। সবার আগে সাহ্‌জলাল। তার দুই শক্ত বাহুর ওপরে মুন্নী।

মুন্নীকে আমার দাওয়ায় শুইয়ে রেখে আমাকে সবার থেকে তফাৎ-এ ডেকে নিয়ে গেল সাহ্‌জলাল।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনলাম ওর সব কথা।

জঙ্গলে রোজকার মতো আজও গিয়েছিল সাহজলাল। এতদিন

পরে ওর বাহু বন্ধনে আজ ধরা দিয়েছিল মুন্নী। কিন্তু কোথা থেকে পাগলের মতো হঠাৎ ছুটে এলো জুবেদা।

ওরা দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বটে কিন্তু জুবেদার রাগ পড়লো না।

সে মুন্নীকে তাড়া করলো। বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে নিশানা করবার আগেই যা সর্বনাশ ঘটবার তা ঘটে গেল। মুন্নীকে পায়ে থেৎলে মেরে ফেলেছে জুবেদা।

মহীশূরের বৃন্দাবন বাগের এক প্রান্তে বসে শুনতে শুনতে কখন যে রাত্রির শেষ অন্ধকারটুকুও সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে গেছে তা লক্ষ্য করি নি। মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা পাখী উড়ে গেল ডাকতে-ডাকতে। ভোর হয়ে গেছে। বিশ্ব প্রকৃতি জেগে উঠেছে, মানুষেরও ঘুম এবার ভাঙলো বলে!

আব্বাসী কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পর আবার বললে, জুবেদা ছিল আমারই আরেক মন। এক মন ছিল আমার ত্যাগের সাধনায় ব্যস্ত, অথচ আরেক মন হিংসার বিষে, নফরৎ এর জ্বালায়, অস্থির হয়ে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে! জুবেদা আমার সেই মনের খবরটা জানতো। নইলে সাহজলালের বাহু বন্ধনে মুন্নীকে দেখে ও' অমন করে ক্ষেপে উঠতো না।

একটু থেমে আবার বললে—মুন্নীরও দোষ নেই, জুবেদারও না। ওরা দু'জনেই ত্যাগে আমার থেকে অনেক বড়ো হয়ে রইলো বাবুজী। আর ঐ দেখুন, আমার ভাই আপ্পাকে। ত্যাগে আপ্পাও আমার থেকে বড়ো; দুনিয়ার ভার-হয়ে-থাকা এই তার অকেজো দাদাটির জন্য সে নিজে সংসার পর্যন্ত ক'রলো না। প্রাণপণে আমার সেবা করে চলেছে। এদের এই খাঁটি ভালোবাসার ভার আমি আর

কতদিন এমন করে মনের মধ্যে বইতে থাকবো, বলতে পারেন বাবুজী ?

... ...

অনেকদিন আগেকার কথা। আব্বাসী আজও বেঁচে আছে কিনা, তা-ও জানি না। কর্মচক্রে ঘুরতে ঘুরতে—সংসার চক্রে বিপর্যস্ত হ'তে হ'তে—তার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে বই কি! সে আমার কেউই নয়, তবু যেন আমার সঙ্গে সে চিরকালের জন্য একাত্ম হয়ে গেছে!